নীলাচল।

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ্, অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেণ্ট্ রাসায়নিক পরীক্ষক

এবং কলিকাতা মেডিকাল্ কলেজের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক

শ্রীচুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য

সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্,

২৫, মহেন্দ্র বসুর লেন, কলিকাতা।

কলিকাতা।

১৯২৬

গোবিন্দচরণাশ্রিতা

হরিনামামৃত-পান-পিপাসিতা

মদীয় সহধর্ম্মিনীর

প্রীত্যর্থে।

নিবেদন।

এই পুস্তকান্তর্ভূত বিষয়ের কিয়দংশ ২৩ বৎসর পূর্ব্বে "সাহিত্য-সভা"য় পঠিত হইয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুরীর বিবরণ, কিছুদিন পূর্ব্বে "পুরীদর্শন" নামক প্রবন্ধে মাসিক বসুমতীর কয়েক সংখ্যায় স্থান পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। অবশিষ্টাংশ এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশিত অংশগুলি সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে নবাংশের সহিত সংযোজিত হইয়া **"নীলাচল"** নামে প্রকাশিত হইল।

স্বর্গগত স্নেহাস্পদ মনোমোহন গাঙ্গুলী প্রণীত উড়িষ্যার প্রাচীন কাহিনী (Orissa and Her Remains) নামক পুস্তক হইতে পুরীর মন্দির-প্রাঙ্গনের নক্সার চিত্র গ্রহণ করিয়াছি, আমি এজন্য তাঁহার নিকট ঋণী। এই পুস্তক-প্রকাশকল্পে তিনি কতিপয় চিত্রফলক (Block) প্রদান করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে আমি সেই সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত হইয়াছি।

চিত্রবিদ্যাবিশারদ কল্যাণভাজন শ্রীযুক্ত কালিধন চন্দ্র পুস্তকস্থিত চিত্রগুলি অঙ্কন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। এস্থলে বলা আবশ্যক যে চিত্রগুলিতে গঠনের কারুকার্য্য প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। রেখার সাহায্যে দৃশ্য পদার্থগুলির বাহ্যিক আকৃতি এবং পরস্পরের সামীপ্য, উচ্চতা ও বিস্তৃতির সামঞ্জস্য প্রদর্শিত হইয়াছে মাত্র।

কয়েকজন ভক্তবন্ধুর অনুরোধে শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "পুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্বম্" নামক পুরীমাহাত্ম্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। ইহা সহজ সংস্কৃতে রচিত বলিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীঅমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের গ্রন্থাগার হইতে এই পুস্তকের জন্য পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ভক্ত এবং ভ্রমণকারী এই উভয় শ্রেণীর পাঠকপাঠিকাগণের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। "নীলাচল" যদি তাঁহাদের কিছুমাত্র উপকারে আইসে, তাহা হইলে গ্রন্থকারের সকল পরিশ্রম সফল হইবে।

কলিকাতা,
১লা অক্টোবর, ১৯২৬।

শ্রীচুণীলাল বসু।

বিষয়-সূচী।

পৃষ্ঠা

পুরীধামে—

চিত্র-সূচী।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধি
১	৯	"স্থাপত্য-বিদ্যার" পূর্ব্বে "ভাস্কর্য্য ও" কথা বসিবে।
৭০	ফুট্‌নোট্ ৫	"শ্রীদান" কথার পরিবর্ত্তে "শ্রীপতেঃ" কথা বসিবে।
১২৮	১	"শিবপ্রসন্ন" স্থলে "শিবা-প্রসন্ন" হইবে।
১৪৮	৭	"তাঁহার" স্থলে "তাহার" হইবে।

নীলাচল।

প্রস্তাবনা।

ইংরাজী ১৯০৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি এক মাসের অবকাশ গ্রহণ করিয়া পুরী গমন করিয়াছিলাম। সেই সময়ে এবং তাহার পরে কয়েক বার উড়িষ্যার নানাস্থানে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির স্মৃতিচিহ্নের কিয়দংশ মাত্র দেখিবার অবকাশ হইয়াছিল। তাহারই একটী ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছি।

এই ভূখণ্ডে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্য-বিদ্যার যে সকল নিদর্শন এখনও কালের এবং তদপেক্ষা অধিকতর নির্ম্মম ধর্ম্মদ্বেষী মানবের আক্রমণ হইতে কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া ধ্বংসাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে, অনুসন্ধিৎসু উড়িষ্যাভ্রমণকারী পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার নিমিত্ত উহাদিগের একটী ক্ষুদ্র বিবরণী এই ক্ষুদ্র পুস্তকমধ্যে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে নূতন কথা বলিবার কিছু নাই। যাহা যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, যাহা ভারতের এবং ভারতের বাহিরের পণ্ডিত-মণ্ডলী কর্ত্তৃক সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হইয়া নানাগ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর নূতন কথা বলিবার কি আছে? তবে

সুবিধা বা অবকাশের অভাব হেতু যাঁহারা ঐ সকল বিস্তৃত বিবরণী পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন না, আশা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তক এ বিষয়ে কতক পরিমাণে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ভ্রমণকালে বিশ্বাসী "সাথীর" কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে।

আর একটী কথা। উড়িষ্যাবাসিদিগকে আমরা সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকি। যাঁহারা প্রায় সার্দ্ধ দ্বি-সহস্র বৎসরকাল ব্যাপিয়া আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি এবং প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার অনুশীলনের নিদর্শন সবিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া যদি কাহারও হৃদয়ে তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মান প্রদর্শন করিবার বাসনা জাগরূক হয়, তাহা হইলে আমি আমার সকল পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

পুরীর পথে।

(১)

তীর্থ-সূত্রে পুরীর বিশেষত্ব।

পুরী হিন্দুদিগের একটী শ্রেষ্ঠ তীর্থ। ইহা শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথ-ক্ষেত্র, নীলাচল, পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে হিন্দুমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। বারাণসীর ন্যায় প্রাচীন না হইলেও পবিত্রতা ও গৌরবে ইহা অদ্বিতীয়, এবং অসাম্প্রদায়িকত্ব-সূত্রে ইহা হিন্দু-তীর্থ-কুলের চূড়ামণিস্বরূপ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এই তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তীর্থমাহাত্ম্যে পুরী যেরূপ পবিত্র, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও সেইরূপ গৌরবান্বিত। বোধ হয় যেন এই তীর্থে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাধন করিয়া একের উপর অন্যের আধিপত্য স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। নীলোর্ম্মি-চঞ্চল অনন্ত-বিস্তৃত মহোদধি এই তীর্থের পদ-প্রক্ষালনে নিয়ত ব্যস্ত রহিয়াছে। অমল-ধবল সৈকতময় বেলা-ভূমি এই তীর্থের পবিত্রতার প্রতিবিম্বস্বরূপ দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। এই তীর্থের পবিত্র উরঃ-শোভিত শ্রীমন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া যেন গোলোক ও ভূলোকের ব্যবধান অন্তর্হিত করিয়া ভক্ত জনের মানসে অপার আশা ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। এই তীর্থের ক্রোড়ে সমাসিত অগণিত মনুষ্যকণ্ঠের অবিরাম উচ্চারিত জগন্নাথের পবিত্র নাম, সংসার-ক্লিষ্ট, দুঃখভারে অবসন্ন মানবের প্রাণে নূতন জীবনী-শক্তি প্রদান করিতেছে। পুরী বাস্তবিকই হিন্দুদিগের একটী অদ্বিতীয় তীর্থ।

এরূপ আকাঙ্ক্ষিত স্থান হইলেও, পুরী এখনকার ন্যায় পূর্ব্বে সুগম ছিল না। কলিকাতা হইতে পুরী যাইতে হইলে কতকদূর জাহাজে,

কতকদূর নৌকায় এবং কতকদূর স্থলপথে যাইয়া পুরী পঁহুছিতে হইত।

রেলপথ হইবার পূর্ব্বে পথকষ্ট ও বিপদ।

জলপথে পুরী যাইবার জন্য দুইটী রাস্তা ছিল। কলিকাতা হইতে গেঁওখালি যাইয়া খালের মধ্য দিয়া ছোট ষ্টীমার বা নৌকা-যোগে কটক পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত। সমুদ্র-পথে যাইতে হইলে কলিকাতা হইতে জাহাজে চাঁদবালি॰ পৌছিয়া তথা হইতে খালের মধ্য দিয়া কটকে গমন করিতে হইত, অথবা বঙ্গোপসাগর দিয়া জাহাজ একেবারে পুরীতে উপনীত হইত। কটক হইতে যাত্রীরা সুপ্রসিদ্ধ "জগন্নাথ সড়ক্" দিয়া গো-যান বা পাল্কী সাহায্যে অথবা পদব্রজে পুরী গমন করিত। কলিকাতা হইতে কটক পর্য্যন্ত যে বিস্তৃত রাজপথ আছে, তাহা মেদিনীপুর, নারায়ণগড়, মোগলমারী, জলেশ্বর, বালেশ্বর, ভদ্রক ও যাজপুরের মধ্য দিয়া কটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কটক হইতে পুরী ৫৩ মাইল দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। জগন্নাথ-সড়ক্ নামক একটী শাখা-পথ কটক হইতে পুরী পর্য্যন্ত গিয়াছে। পূর্ব্বে সামান্য অবস্থার যাত্রিগণ অনেকেই স্থল-পথ দিয়া পুরী গমন করিত। জগন্নাথ-সড়ক্ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার রাস্তা; ইহাতে ৩ হইতে ৫ মাইল অন্তর এক একটী করিয়া পান্থশালা অবস্থিত আছে। স্থলপথে পুরী যাইতে হইলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদী পার হইতে হয়। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে এই সকল নদী সহজেই হাঁটিয়া পার হইতে পারা যায়। পূর্ব্বে বর্ষাকালে নৌকাযোগে নদী পার হইতে হইত। অধুনা উহাদিগের উপর রেলওয়ে-সেতু নির্ম্মিত হওয়াতে পারাপারের কষ্ট নিবারিত হইয়াছে।

জাহাজে পুরী যাইতে হইলে অসুবিধার সীমা ছিল না। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু নর-নারী মাত্রেই জাহাজে এক প্রকার অনশন-ব্রত অবলম্বন

করিয়া থাকিতেন। স্থলপথেও যে কষ্টের কিছু অভাব ছিল, তাহা নহে। অত্যন্ত খাদ্য সামগ্রীর অসদ্ভাব, পথ-ক্লান্তি-নিবারণ ও রাত্রি-যাপনের জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম-স্থানের অভাব, পরিষ্কৃত পানীয় জলের অনাটন, পথিমধ্যে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা, এই সকল অসুবিধা যাত্রিদিগের সবিশেষ ক্লেশের কারণ হইয়া উঠিত। মধ্যে মধ্যে ভীষণ বিসূচিকা-রোগ প্রবল হইয়া শত শত যাত্রীকে দারুণ পথকষ্টের হস্ত হইতে মুক্তি প্রদান করিত। যাহারা রোগাক্রান্ত হইত, অনেকস্থলে জীবিতাবস্থাতেই সহ-যাত্রীদিগের দ্বারা তাহারা পথের ধারে পরিত্যক্ত হইত এবং এরূপ অসহায় অবস্থা দেখিয়া রোগ যাহা সাধন করিতে মমত্ব ও বিলম্ব প্রকাশ করিত, মাংসলোলুপ শৃগাল, কুক্কুর ও শকুনি দ্বারা তৎকার্য্য অনতিবিলম্বে সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বে হাঁটা পথে ডাকাইতের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। সুখের বিষয় এই যে, অধুনা এ সম্বন্ধে ভয় করিবার কোন বিশেষ কারণ নাই; কিন্তু এখনও স্থলপথে যাইতে আর একটী বিপদ্ আছে। আজিও পশ্চিমদেশ-বাসীরা অনেকে স্থলপথে পুরী গমন করিয়া থাকে। পথিমধ্যে চটিতে বিশ্রাম করিবার সময় কখন কখন দুষ্ট লোক আসিয়া তাহাদের খাদ্যের সহিত ধুতুরার বীজ মিশ্রিত করিয়া দেয় ও তাহারা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করে। অধিক দিনের কথা নহে, ছয় জন যাত্রী জগন্নাথ-সড়ক্ দিয়া পদব্রজে পুরী যাইতেছিল। ভদ্রকের নিকট দুই জন অপরিচিত ব্যক্তি, তাহারাও পুরী যাইতেছে বলিয়া উহাদের নিকট পরিচয় প্রদান করে এবং বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহাদের খাদ্য পাক করে। সেই খাদ্য ভক্ষণে উক্ত ছয় জন যাত্রী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই অবসরে ঐ দুই ব্যক্তি তাহাদের নিকট যাহা কিছু ছিল, সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। পুলিশ ৫ জনকে

পথের ধারে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত দেখিয়া ভদ্রকের হাসপাতালে লইয়া যায়; তথায় শুশ্রূষা দ্বারা তাহারা আরোগ্য লাভ করে। তখন তাহারা বলে যে, তাহাদের সঙ্গে আর একজন যাত্রী ছিল; সেও ঐ খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছিল। পুলিশ অনুসন্ধান করিতে করিতে ঐ ব্যক্তির মৃত দেহ একটী ধান্য-ক্ষেত্রে পতিত রহিয়াছে দেখিতে পায়। শবচ্ছেদের পর মৃত ব্যক্তির পাকাশয়াদি এবং খাদ্য দ্রব্যাদির পরিত্যক্তাংশ ও বমি, আমার নিকট রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। মৃতব্যক্তির পাকাশয়ে, খাদ্য দ্রব্যে ও বমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ধুতুরা ছিল। এইরূপে বিষ প্রয়োগ দ্বারা অসন্দিগ্ধ যাত্রীদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ ও নিধন-সাধনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বহুপূর্ব্বে ঠগজাতীয় দস্যুদিগের ফাঁসি লাগাইয়া হত্যা-সাধন এবং খাদ্যে ধুতুরা প্রয়োগ জাতিব্যবসা ছিল।

রেল পথ।

এক্ষণে রেল হইয়া পুরী যাইবার দুঃখ ঘুচিয়া গিয়াছে। রেলপথে পুরী এগার ঘণ্টার রাস্তা মাত্র। অপরাহ্ণ পাঁচটা চব্বিশ মিনিটের সময় হাওড়ায় "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের" মাদ্রাজ মেল্ গাড়িতে উঠিলে রাত্রি আড়াইটার সময় খুর্‌দা রোড্ জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেয় এবং গাড়ী বদল করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পুরীতে উপস্থিত হওয়া যায়। পুরী এক্সপ্রেস্ এখন সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময়ে ছাড়ে এবং এগার ঘণ্টার মধ্যে পুরী পৌঁছাইয়া দেয়; পথে নামিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হয় না। পুরী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে যাইলেও খুর্‌দা রোড্ জংশনে গাড়ী বদল করিবার আবশ্যক হয় না, তবে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হয়; রাত্রি দশটা পনের মিনিটের সময় হাবড়ায় উঠিলে পরদিন বৈকালে সাড়ে পাঁচটার সময়ে পুরী পৌঁছান যায়।

(২)

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পুরী যাইতে হইলে অনেকগুলি নদ ও নদী পার হইতে হয়। সকল নদীর কলেবর সমান নহে। বিশালদেহ রূপনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্বঙ্গী ভার্গবী পার হইলে পুরী-যাত্রার জলপথের অবসান হইয়া থাকে। রূপনারায়ণ পার হইয়া সুবর্ণরেখা এবং উহার উপর জলেশ্বর সহর অবস্থিত।

রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা।

সুবর্ণরেখার পর বলং নদী; সুপ্রসিদ্ধ বালেশ্বর নগর ইহার তট-দেশের শোভা সম্পাদন করিতেছে। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা উড়িষ্যার মুসলমান-শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে ঐ প্রদেশে বাণিজ্যার্থে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরে কটকের নিকট হরিহরপুরে ও বালেশ্বরে তাঁহারা কুঠী নির্ম্মাণ করেন। বঙ্গদেশের সন্নিকটে ইংরাজদিগের বাণিজ্যোপনিবেশ-সংস্থাপনের ইহাই প্রথম চেষ্টা। এখানে হিন্দুর প্রাচীন কীর্ত্তির কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল দূরে নীলগিরি-পর্ব্বতমালায় সানুদেশে তৎপ্রদেশের রাজার ভবন অবস্থিত। বালেশ্বরে হিন্দু-দেবতার মন্দিরের মধ্যে জড়েশ্বর, মহাদেব ও চোরা গোপীনাথের মন্দিরই উল্লেখযোগ্য। চোরা গোপীনাথ কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত দণ্ডায়মান গোপাল মূর্ত্তি। বালেশ্বরের নিকট সোরে নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কাংসা ও পিত্তল-নির্ম্মিত বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বালেশ্বর।

বলং পার হইলে সালন্দী। ভদ্রক সহর এই নদীর তীরে অবস্থিত। ভদ্রকালী দেবীর নাম হইতে এই সহরের নামকরণ হইয়াছে। ভদ্রকের জল-বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর; এজন্য সঙ্গতিপন্ন উড়িষ্যাবাসিগণ বায়ু-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে এই স্থানে অবস্থান করেন। এই নগরে অতি সুন্দর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেব-স্থানের মধ্যে ভদ্রকালীর মন্দির ও গোপালজিউর মঠ প্রসিদ্ধ।

ভদ্রক।

সালন্দী পার হইলে পর মর্ত্ত্যলোক ও প্রেতলোকের সন্ধি-স্থলে অবস্থিতা স্বনাম-খ্যাতা বৈতরণী নদী। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যাজপুরনগর বৈতরণীর তটে অবস্থিত। এই স্থান গদাক্ষেত্র, যজ্ঞপুর, বিরজাক্ষেত্র, নাভিক্ষেত্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। গয়াক্ষেত্রে গয়াসুরের মস্তক অবস্থিত; এইরূপ প্রবাদ যে, যাজপুরে তাহার নাভি সংস্থিত রহিয়াছে। অপর মতে ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হইবার সময় তাঁহার নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এইজন্য যাজপুর নাভিক্ষেত্র নামেও অভিহিত।

বৈতরণী ও যাজপুর।

যযাতিকেশরী নামক কেশরিবংশীয় নৃপতি ৪৭৪ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করিবার পর যাজপুরে প্রথমতঃ রাজধানী স্থাপন করেন। * ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে বঙ্গ ও বিহারের পাঠান শাসনকর্ত্তা সুলেমান করাণীর সুপ্রসিদ্ধ বিধর্ম্মী সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যাবাসীদিগের যাজপুরের সন্নিকটে একটী ভয়ানক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে উড়িষ্যার তৎকালীন রাজা মুকুন্দদেব নিহত হইয়াছিলেন

---

* ডাক্তার ফ্লীট্, এবং অপর কয়েকজন প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতে যযাতি কেশরীর রাজত্বকাল অষ্টম খৃষ্টাব্দের শেষে বা নবম খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নির্দ্দিষ্ট হয়।

এবং উড়িষ্যাবাসিগণ পরাজিত হইয়া মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে। যাজপুরে যে সকল হিন্দুমন্দির ছিল, কালাপাহাড়ের অত্যাচারে সে গুলি চূর্ণ বিচূর্ণীকৃত এবং তন্মধ্যে অবস্থিত দেবমূর্ত্তিসমূহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া বৈতরণীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি যাজপুর শ্রীভ্রষ্ট।

কালাপাহাড়ের পাঠান সেনাপতি সৈয়দ আলি বুখারির সমাধিস্থান যাজপুরে অবস্থিত। কথিত আছে যে একটি হিন্দু-দেব-মন্দিরের ধ্বংস সাধন করিয়া মুসলমান-সেনাপতির গোর-স্থান নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যাজপুরে বিস্তর দেবপূজক ব্রাহ্মণের বাস। কথিত আছে যে, আদিশূরের ন্যায় রাজা যযাতিকেশরীও যজ্ঞার্থে বহু বেদজ্ঞ সুব্রাহ্মণ কনোজ হইতে আনয়ন করিয়া যথাযোগ্য বৃত্তি প্রদান পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করাইয়াছিলেন।

প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে বৈতরণীর তীরে বরাহনাথের মন্দির, দশাশ্বমেধ-ঘাট, অষ্ট-মাতৃকার মণ্ডপ, এবং বিরজা দেবীর মন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বরাহনাথের মন্দির।

রাজা পুরুষোত্তম দেবের পুত্র প্রতাপরুদ্র কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বরাহনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মন্দিরে গো-দান করিলে গো-পুচ্ছ ধারণ করিয়া তপ্ত বৈতরণী পার হইবার অধিকার লাভ হয়। গাভীর পরিবর্ত্তে মূল্য-স্বরূপ ৫ টাকা দান করিলেই, গো-দানের ফললাভ হয়।

দশাশ্বমেধ-ঘাট।

বরাহনাথের মন্দিরের সম্মুখে বৈতরণীর তীরে যে ঘাট অবস্থিত, তাহার নাম দশাশ্বমেধ-ঘাট। প্রবাদ এই যে ব্রহ্মা এই স্থানে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন

করিয়া ভগবান্ বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিয়া বেদ উদ্ধার করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা যযাতিকেশরীর দ্বারাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই জন্য তিনি কনোজ হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

বরাহনাথের মন্দিরের পশ্চাতে জগন্নাথ দেবের একটী মন্দির আছে।

বিরজার মন্দির।

এই স্থান হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে বিরজাদেবীর মন্দির। ইহা একটী পীঠস্থান। মন্দির-মধ্যে ক্ষুদ্রকায়া পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অবস্থিত আছে; ইহাকে ব্রহ্মাকুণ্ড বা বিরজাকুণ্ড কহে। এস্থানে আর একটী কূপও আছে; উহা নাভিগয়া নামে প্রসিদ্ধ।

বৈতরণীর অপর পারে অষ্ট মাতৃকার মণ্ডপ। নিম্নলিখিত আটটি

অষ্ট মাতৃকার মণ্ডপ।

পাষাণময়ী দেবীমূর্ত্তি এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন—(১) ঐরাবত-সমাশ্রিতা, সুবেশা, সালঙ্কারা, বজ্রহস্তা ইন্দ্রাণী; (২) গরুড়াসনা, শান্তমূর্ত্তি বৈষ্ণবী; (৩) বৃষারূঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী চন্দ্ররেখা-বিভূষণা, মাহেশ্বরী; (৪) শিখিবাহনা, কান্তবপুঃ কৌমারী; (৫) হংসপৃষ্ঠ-সমারূঢ়া, সর্ব্বাভরণ-ভূষিতা-ব্রহ্মাণী; (৬) মহিষাসনা, বরাহবদনা বারাহী; (৭) নগ্নদেহা, সর্পভূষিত-কবরী, মুণ্ডমালিনী, ভীষণা চামুণ্ডা এবং (৮) তারপ্রপীড়িতা; বিশুষ্কদেহা, যমপ্রসূতি ছায়া—পুরাণোক্ত এই অষ্টমাতৃকার মূর্ত্তি মণ্ডপ-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি সাধারণ মনুষ্যাকৃতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ, নীল-প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং চতুর্ভুজ; ইহাদিগের নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন কোন পুস্তকে অষ্টমাতৃকার পরিবর্ত্তে সপ্ত মাতৃকার উল্লেখ আছে।

যাজপুর হইতে অনতিদূরে "শুভস্তম্ভ" নামক ৩৭ ফিট্ উচ্চ অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ অবস্থিত আছে। ইহার উপর পূর্ব্বে একটী গরুড়-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, কালাপাহাড় তাহা নষ্ট করে। মুসলমানেরা এই স্তম্ভ ধ্বংস করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ইহা কেশরিবংশীয় রাজাদিগের জয়স্তম্ভরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

শুভ-স্তম্ভ।

পূর্ব্বে এইস্থানে শান্তমাধব নামে একটী বৃহৎ প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি অবস্থিত ছিল। মূর্ত্তির নাভিদেশ পর্য্যন্ত ভূমির উপরে অবস্থিত এবং অধোভাগ ভূগর্ভে প্রোথিত ছিল। এক্ষণে এই মূর্ত্তি অপর কয়েকটী মূর্ত্তির সহিত ভগ্নাবস্থায় স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে রক্ষিত হইয়াছে।

শান্তমাধব।

পুরীর আঠার নালার ন্যায় যাজপুরের অনতিদূরে "এগার-নালা" নামক একটী জলপথ ও তদুপরি একটি সেতু আছে।

এগার-নালা।

যাজপুর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে; তাঁহার নাম অগ্নীশ্বর। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই যে, প্রতিদিন তাঁহার বর্ণের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

অগ্নীশ্বর।

কটক। বৈতরণী পার হইয়া ব্রাহ্মণী এবং ব্রাহ্মণীর পর মহানদী এবং কাঠজুড়ি; এই শেষোক্ত নদী দুইটীর সঙ্গমস্থলে সুপ্রসিদ্ধ কটক সহর অবস্থিত।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল নদীর উপর রেল যাইবার জন্য সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। অধিকাংশ সেতুই অতিশয় বিস্তৃত এবং দেখিতে সুদৃশ্য। সেতুর উপর রেলগাড়ি উঠিলে নিম্নদেশে বহুবিস্তৃত বালুকাময় নদীগর্ভ এবং দুই পার্শ্বে শ্যামল-বিটপি-মণ্ডিত ও হরিদ্বর্ণ-শস্যক্ষেত্র-পূর্ণ তটরাজি আরোহীর নয়নের তৃপ্তি সম্পাদন করে। আমি বর্ষার পূর্ব্বে পুরী গমন করিয়াছিলাম। সে সময় মহানদী প্রায় জলশূন্য। নদীগর্ভ বহুবিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে স্বচ্ছ নীর-ধারা, বালুকারাশি ভেদ করিয়া মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। বোধ হইতেছিল যেন সরিৎরাণী প্রাবৃট্কালের সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিয়া অভিমানে বালুকামধ্যে ক্ষীণতনু লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বালুকাময় নদীগর্ভের উপর দিয়া মনুষ্য ও গবাদি পশুসকল সচ্ছন্দে যাতায়াত করিতেছে। যে যে স্থানে ক্ষীণ-ধারা প্রবাহিত, তাহা নিতান্ত স্বল্পগভীর ও মন্দগতি। মহানদীর সেতু দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল; রেলগাড়ী পার হইতে প্রায় ৪ মিনিট সময় লাগে। মহানদীর স্থানে স্থানে সুবৃহৎ "চর" পড়িয়াছে, দেখিলাম। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে নানা জাতীয় শস্য এই সকল চরে উৎপন্ন হয় এবং ইহারা গো-চারণের স্থান-রূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কাঠজুড়ি বাঁধ। কেশরি-বংশীয় রাজা নৃপতি কেশরী ৯৪০ হইতে ৯৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত

ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কটকে সংস্থাপিত হয়। প্রতিবৎসর কটক, মহানদী ও কাঠজুড়ির বন্যা দ্বারা প্লাবিত হইয়া সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত। ৯৫৫।৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা মকরকেশরী জলপ্লাবন-নিবারণের নিমিত্ত কাঠজুড়ির প্রসিদ্ধ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহা প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল ও উচ্চতায় ২৫ ফিট। দৃঢ়তা ও নির্ম্মাণ-নৈপুণ্যে ইহা সবিশেষ প্রশংসনীয। প্রায় সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, আজিও ইহা অক্ষুণ্ণ ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কটক নগরীকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিতেছে।

কটকের কাছারি ও অনেকগুলি সরকারি আপিস্ কাঠজুড়ির বাঁধের উপর অবস্থিত। এই স্থানে নগরবাসীগণ দৈনিক কার্য্যাবসানে সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিতে আগমন করেন।

দুর্গ, কলেজ ও ভজনালয়।

কটক একটী বৃহৎ সহর; ইহাতে বিস্তর বৃহৎ সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা আছে। রাস্তাগুলি প্রশস্ত এবং বহুলোক এই নগরে বাস করে। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কটকের পুরাতন দুর্গের নিকট মহানদীর তীরে বাস করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; এক্ষণে এই দুর্গে ইংরাজ সেনা-নিবাস অবস্থিত। দুর্গের চতুঃপার্শ্বে বারবাটী নামক বহু বিস্তৃত প্রান্তর। কটকে তিনটী গির্জ্জা, মুসলমানদিগের একটী বৃহৎ মসজিদ এবং অনাথ খৃষ্টান বালক-বালিকাদিগের থাকিবার একটী আশ্রম আছে। ইউরোপীয় বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে; সম্ভ্রান্তবংশীয় দেশীয় বালকগণের এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার নিষেধ নাই। উচ্চ শিক্ষার নিমিত্ত কটকে একটী কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে। রাভেন্স নামক ভূতপূর্ব্ব একজন ইংরাজ

কমিশনারের নামে এই কলেজটী অভিহিত। এখানে এম, এ, পর্য্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। সমগ্র উড়িষ্যাদেশের মধ্যে এই একটী কলেজ থাকিলেও, কলেজের গৃহ যথোপযুক্ত প্রশস্ত বা সৌষ্ঠবসম্পন্ন নহে। কলেজের পার্শ্বেই একটী ক্ষুদ্রায়তন জরীপ্ বিদ্যালয় (Survey School) অবস্থিত।

মেডিক্যাল স্কুল। কটকের সাধারণ চিকিৎসালয় এক অতি বৃহৎ এবং বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। চিকিৎসালয়ের সংস্রবে একটি মেডিক্যাল স্কুল আছে। কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের যাহা নির্দ্ধারিত পাঠ্য, কটক মেডিক্যাল স্কুলেও ঠিক তাহাই। কটক হাসপাতালের বাঙ্গালী ডাক্তারগণ এই মেডিক্যাল স্কুলের শিক্ষক এবং কটকের সিভিল সার্জ্জন্ ইহার তত্ত্বাবধায়ক। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীদিগের বেতন ও পদমর্য্যাদা ক্যাম্বেল মেডিক্যাল্ স্কুলের ছাত্রদিগের সহিত সমান। শিক্ষার উপকরণ সম্বন্ধে কটক্ মেডিক্যাল স্কুলে এখনও অনেক অভাব রহিয়াছে। এজন্য ক্যাম্বেল মেডিক্যাল্ স্কুলের ছাত্রদিগের কটকের ছাত্রগণ অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিবার সুবিধা আছে। এই সকল অভাব মোচন করিবার ক্রমশঃ চেষ্টা হইতেছে। কনিকার রাজা স্ত্রীচিকিৎসার নিমিত্ত একটি হাসপাতাল করিবার জন্য ২৫,০০০ টাকা দিয়াছেন ;

কামারশালা। হাসপাতাল হইতে কিঞ্চিদ্দূরে একটি বৃহৎ কামারশালা (Workshop) অবস্থিত। স্থানীয় রেলওয়ের এবং গভর্ণমেণ্ট পূর্ত্ত-বিভাগের কার্য্যে যে সকল লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যের প্রযোজন বা পুরাতন দ্রব্যের সংস্কারের আবশ্যক হয়, তাহা এই কারখানায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। কলের সাহায্যে অত্যন্ত মোটা

লৌহ যেরূপ সহজে কর্ত্তিত হইতেছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

আনিকট্।

এই কারখানার নিকটেই বিখ্যাত "আনিকট" (Annicut)। ইহা একটি বাঁধ; এই বাঁধ দ্বারা মহানদীর একস্থানে প্রচুর পরিমাণে জল আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আবদ্ধ জলভাগ একটি প্রশস্ত হ্রদের ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। বাঁধের উপরিভাগ বেড়াইবার একটি সুরম্যস্থান। গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এই স্থানে অনেকেই সুশীতল সমীর-সেবনার্থে আগমন করিয়া থাকেন। বাঁধের অপর পার্শ্বে মহানদী শুষ্ক প্রায়; দুই এক স্থানে ক্ষীণধারা মৃদুগতিতে কিয়দ্দূর প্রবাহিত হইয়া বালুকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই স্থান জলে পরিপূর্ণ থাকে।

তুলসীপুর।

তুলসীপুর কটকের একটি স্বাস্থ্যকর পল্লী। এই স্থানে অনেক ইংরাজ, রাজা ও জমিদারেরা বাস করেন। উড়িষ্যার বর্ত্তমান কমিশনার (১৯০৩) মাননীয় কে, জি, গুপ্ত মহাশয় কাঠজুড়ির উপর লালবাগ নামক স্থানে বাস করেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্গ ও অশ্বশালা।

উড়িষ্যা যখন মহারাষ্ট্রীয় দিগের অধীন ছিল, তখন তাহারা কটকে একটি দুর্গ ও একটি অতি বিস্তৃত অশ্ব-শালা নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই দুর্গ ও অশ্বশালা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অশ্ব-শালার ছাদগুলি খিলান করা এবং স্তম্ভের উপর সংস্থিত; কড়ি বা বরগার সম্পর্ক নাই। এই স্থানে এক্ষণে রিজার্ভ্ পুলিশ অবস্থিত।

বাজার।

কটকে অনেকগুলি বাজার আছে। একটি প্রচলিত কথা মতে কটকে ৫২টি বাজার ও ৫৩টি গলি থাকিবার কথা। এতগুলি বাজার আছে কি না, আমরা সে বিষয়ে

অনুসন্ধান লই নাই; তবে বাজারগুলির মধ্যে চৌধুরীবাজার, বালু-বাজার, নয়া-সড়ক্-বাজার, বক্সিবাজার, চাঁদনিচক্, তৈলঙ্গবাজার, বাখরাবাদ এবং মঙ্গলা বাগের নামই উল্লেখের যোগ্য।

দেবমন্দির ও মঠ।

কটকের প্রাচীন হিন্দু-মন্দিরের মধ্যে গোপালজী ও রঘুনাথজীর মন্দিরই উল্লেখ-যোগ্য। কটক-চণ্ডী কটকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ইঁহার মন্দির কটকের দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত। শুনিলাম, ইঁহার পূজার নিমিত্ত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি নিয়োজিত আছে। ইনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের দেবতা; মহারাষ্ট্রীয় শাসনকালে ইনি দুর্গের মধ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বালু-বাজারে শঙ্করাচার্য্যের একটি মঠ আছে; এখানে অনেক সাধু সন্নাসী বাস করেন। ইহা ব্যতীত শিখদিগের একটি মঠ, একটি জৈন-মন্দির ও বৈষ্ণবদিগের অনেকগুলি মঠ কটকে অবস্থিত আছে। যেখানে শিখ-মঠ অবস্থিত, প্রবাদ এই যে তথায় বাবা নানক, বালা ও মর্দ্দানা নামক তাঁহার দুই অনুচরের সহিত কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন। শিখ-দিগের দশম গুরু গুরুগোবিন্দের সময়ে এই মঠের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের মঠে প্রত্যহ অতিথি সেবা হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক মঠে একটা বা ততোধিক বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

কটকের শিল্পকার্য্য।

কটক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের শিল্প-কার্য্যের নিমিত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এখানে হস্তিদন্ত ও শৃঙ্গনির্ম্মিত বিবিধ সুন্দর সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট রেশমপাড় ধুতি, উড়ানি ও সাড়ী এবং মানিয়াবন্দী নামক বস্ত্র, কটক হইতে কিছু দূরে বড়াম্বা ও তিগরিয়া নামক স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং কটকে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। কটকের চটি জুতা কলিকাতার অনেকেই ব্যবহার করিয়া

থাকে না। কাঠের উপর নক্সার কাজও কটকে সুন্দর হইয়া থাকে। কটকের ব্যবসাস্থানে গমন করিলে উড়িষ্যাজাত নানাবিধ শিল্পকার্য্যের নমুনা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভুবনেশ্বর। কটক ও খুরদা জংশনের মধ্যস্থলে ভুবনেশ্বর ষ্টেশন। এই স্থানে নামিয়া বিখ্যাত ভুবনেশ্বরের মন্দিরে গমন করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে মন্দির প্রায় দুই মাইল পথ। এই পথ বেশ প্রশস্ত ও পরিষ্কার ; তবে পার্ব্বত্য প্রদেশ বলিয়া সর্ব্বত্র সমতল নহে। কেহ পদব্রজে, কেহ বা গরুর গাড়ীতে এই পথ দিয়া গমন করেন। গরুর গাড়ীর ভাড়া তখন দুই আনা মাত্র ছিল। ট্রেনের সময় গরুর গাড়ী, ষ্টেশনে উপস্থিত থাকে। এখানকার ষ্টেশনমাষ্টার ও রেলওয়ের অপরাপর কর্ম্মচারিগণ মাদ্রাজ প্রদেশবাসী। ইঁহারা সকলেই ইংরাজী জানেন।

প্রাচীন ইতিহাস। দূর হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের চূড়া দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অভ্রভেদী চূড়া, কত যুগ-যুগান্তরের শীতাতপ সহ্য করিয়া, কত সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন লক্ষ্য করিয়া, কত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও বিলয় এবং কত জাতির আবির্ভাব ও তিরোভাব অবিচলিত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বরত্বের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ গগন-পথে বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, কেশরিবংশীয় রাজা যযাতিকেশরী, উড়িষ্যা অধিকার করিয়া প্রথমতঃ যাজপুরে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৫২ বৎসর কাল উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। * তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে রাজধানী, যাজপুর হইতে

* ইঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে মতবিভিন্নতা লক্ষিত হয় ; ইহা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হয়। কথিত আছে যে, তিনি যবনদিগের হস্ত হইতে উড়িষ্যা উদ্ধার করেন। সুবিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, বৌদ্ধগণই এস্থলে যবন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং যযাতিকেশরী, বৌদ্ধগণকে বিতাড়িত করিয়া উড়িষ্যায় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যযাতিকেশরীর পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি মগধ হইতে আগমন করিয়া উড়িষ্যা জয় করেন। যযাতিকেশরীর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নিকট এখনও দৃষ্টিগোচর হয়।

যযাতিকেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্যের কল্পনা ও আয়োজন করিয়াছিলেন মাত্র। তিনি এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অধস্তন চতুর্বিংশতি পুরুষ ভুবনেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার প্রপৌত্র বিখ্যাত ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে ভুবনেশ্বর-মন্দিরের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাপ্ত হয়।

ভুবনেশ্বর বহুকাল পর্য্যন্ত একাম্রকানন নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কপিল-সংহিতায় এইরূপ বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে অতি প্রকাণ্ড উচ্চশির একটিমাত্র আম্র বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হইত। বারাণসী পাপে পূর্ণ হওয়াতে নারদের পরামর্শে মহাদেব, ত্রেতাযুগের কোন সময়ে কাশী পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। একাম্রপুরাণ ও একাম্রচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থদ্বয়ে ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, পুরীর মন্দিরের বিবরণীর মধ্যে উদয়গিরির শিলালিপিসমূহে যে ঐশ্বর্য্যশালিনী কলিঙ্গ-নগরী এবং প্রবলপ্রতাপান্বিত কলিঙ্গ-নৃপতিদিগের উল্লেখ আছে,

তাহা এই ভুবনেশ্বর সম্বন্ধেই লিখিত। তাঁহার মতে ভুবনেশ্বরই প্রাচীন কলিঙ্গ নগরী। এই নগর অশোকের শাসনাধীন ছিল। এই স্থানের নিকটবর্ত্তী ধৌলি পর্ব্বতে অশোকের একখানি অনুশাসন-লিপি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

ভুবনেশ্বরের মন্দির, পুরীর মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, কিন্তু পরিধিতে অধিকতর বিস্তৃত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরটী পুরীর মন্দিরের ন্যায় চারি অংশে বিভক্ত, যথা—ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, জগমোহন ও দেউল। ভোগমণ্ডপে ভোগের সামগ্রী সজ্জিত করা হয়। নাট-মন্দিরে নৃত্য, গীত ও অন্যান্য উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্দিরের যে অংশে ভুবনেশ্বর অবস্থিত, তাহার নাম দেউল এবং নাটমন্দির হইতে দেউলে প্রবেশ করিবার যে বিস্তীর্ণ পথ আছে, তাহা মোহন ও জগমোহন নামে প্রসিদ্ধ। দেউল ও জগমোহন, নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মন্দিরের মধ্যে ভুবনেশ্বর-নামধেয় প্রস্তরময় লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। ভুবনেশ্বরের পূর্ণ নাম ত্রিভুবনেশ্বর; ইনি কৃত্তিবাস এবং লিঙ্গরাজ নামেও অভিহিত। কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের ন্যায় ইঁহার প্রস্তরময় দেহ ভূমির মধ্যেই প্রোথিত; স্বল্পাংশমাত্র ভূমি হইতে কিঞ্চিদূর্দ্ধে অবস্থিত। দেহের ব্যাস প্রায় ছয় হস্ত; চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণমর্ম্মর প্রস্তরের বৃত্তাকার নাতিপ্রশস্ত বেদী। একস্থানে ইহা প্রদীপের মুখের ন্যায় সরু হইয়া গিয়াছে। লিঙ্গের চারি ধার স্বর্ণপত্রের দ্বারা মণ্ডিত। পাণ্ডাদিগের মতে ইনি শুদ্ধ হর নহেন, হরির সহিত মিলিত হইয়া একস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত লিঙ্গরাজের শিরোদেশে যে একটী শ্বেত রেখার চিহ্ন
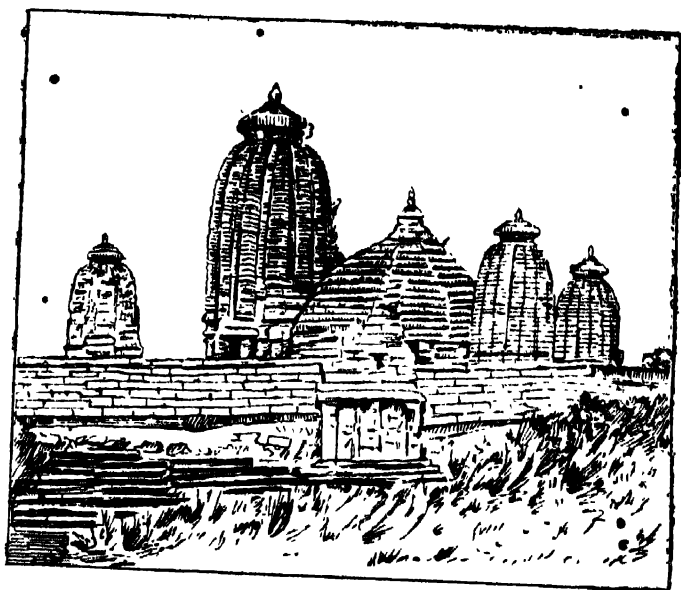
ভুবনেশ্বর-মন্দির।

বিদ্যমান রহিয়াছে, পাণ্ডাদিগের মতে উহা শ্যামতনু বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত রজতশুভ্র কৈলাসনাথের মিলন প্রতিপাদন করিতেছে। ইঁহার গাত্রে কয়েকটী ধূসররেখা গঙ্গা ও যমুনার সিত ও অসিত প্রবাহ-ধারারূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। পাণ্ডাদিগের এরূপ কল্পনার ভিত্তি কি, তাহা জানি না। তবে ইহা সত্য যে ভুবনেশ্বরের ন্যায় শৈব-প্রধান স্থানেও বিষ্ণুর বাসুদেব-মূর্ত্তির পূজা অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, যাত্রিদিগকে প্রথমে অনন্ত বাসুদেবের পূজা সমাপন করিয়া ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে যাইতে হয়। কোন কোন গ্রন্থে উক্ত আছে যে, এই বাসুদেবের অনুরোধে ভুবনেশ্বর এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই সকল কারণেই পাণ্ডাগণ, দেবতার মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, একাধারে হরি-হর মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া থাকে।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের অভ্যন্তরের ন্যায় ইহাও গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দিবা দ্বিপ্রহরের সময়েও উজ্জ্বল আলোক ব্যতীত মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত কোন বস্তুই দৃষ্টিগোচর হয় না। গঙ্গাজল, দুগ্ধ এবং সিদ্ধিই ভুবনেশ্বরের পূজার প্রধান উপকরণ এবং বিল্বপত্র, পুষ্প ও মাল্যং দ্বারা ইঁহার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। গৃহের তলদেশে রাশি রাশি বিল্বপত্র সঞ্চিত রহিয়াছে। পূজা শেষ হইলে ভক্তগণ, তালপত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরকে ব্যজন করিয়া থাকেন। দেব-পূজকগণ যখন ভুবনেশ্বরের সম্মুখে বিল্বপত্রপূর্ণ-বদ্ধাঞ্জলি-ভক্তকে পাপক্ষালনের মন্ত্র পাঠ করান, তখন হৃদয়-মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের উদয় হয়। ভুবনেশ্বরের পূজার পদ্ধতি, পুরীর জগন্নাথ দেবের পূজার পদ্ধতির ন্যায়। মঙ্গলারতি, স্নান, বস্ত্র-পরিধান, বাল্যভোগ, মধ্যাহ্ন-ভোগ, বিশ্রাম, সন্ধ্যা-ভোগ, আরতি, শয়ন প্রভৃতি দ্বাবিংশতি প্রকার

ভিন্ন ভিন্ন প্রাত্যহিক কার্য্য আচরণ করিয়া দেবসেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। জগন্নাথ দেবের সেবা-বর্ণনার সময় এ বিষয়ের সবিস্তর উল্লেখ করা যাইবে।

জগন্নাথদেবের ন্যায় সময়ে সময়ে ভুবনেশ্বরেরও যে সকল উৎসব হইয়া থাকে, তাহাদিগকে "যাত্রা" কহে। যাত্রার সময়ে ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি চন্দ্রশেখরের পিত্তলময়ী মূর্ত্তি, মন্দির হইতে মহাসমারোহের সহিত বাহির করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নীত হইয়া থাকে। শিবরাত্রিতে এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাবেশ হয়। আষাঢ ব্যতীত চৈত্র বা বৈশাখমাসে অশোকাষ্টমীর দিনে এখানে রথযাত্রা হইয়া থাকে। পুরীর ন্যায় এখানেও বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা হয়। বিন্দুসরোবরের মধ্যস্থলে যে দেবালয় অবস্থিত, তন্মধ্যে প্রতিনিধি চন্দ্রশেখর দ্বাবিংশতি দিবস অবস্থিতি করেন এবং তথায় মহাসমারোহে তাঁহার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভুবনেশ্বর, মহাদেবের প্রতিরূপ হইলেও তাঁহার যাত্রাগুলি বৈষ্ণবযাত্রার সম্পূর্ণ অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের সেবা ও উৎসব, জগন্নাথ দেবের সহিত প্রায় একরূপ। অন্যান্য যে সকল স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা হয়, তথায় প্রায় এই সমস্ত উৎসবই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের খোদাই কার্য্য যেরূপ, পুরীর মন্দিরের সর্ব্বাংশে সেরূপ নহে। পুরীর দেউলের প্রাচীরে যে সকল ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি সংলগ্ন রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি চুণ ও বালির দ্বারা গঠিত; পুরীর নাটমন্দিরের প্রতিমূর্ত্তিগুলি প্রস্তর হইতে খোদিত। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সমস্ত প্রতিমূর্ত্তিই প্রস্তর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কত দেব-দেবীর মূর্ত্তি, কত পৌরাণিক ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র, কত সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনাবলী

মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে সুন্দররূপে খোদিত হইয়া প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, শৌর্য্য, বীর্য্য, বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের এক প্রান্তে একটী গৃহ-মধ্যে এক প্রকাণ্ড বৃষভমূর্ত্তি অবস্থিত আছে; ইনিই ভুবনেশ্বরের বাহন। পার্শ্বে নীল-প্রস্তর-খোদিত লক্ষ্মী-নারায়ণ-মূর্ত্তি। অনতিদূরে অপর একটি মন্দিরের মধ্যে গোপালিনী মূর্ত্তি। ইনি ভগবতী; ছদ্মবেশে একাম্র কাননে গোচারণ করিতেন এবং এই বেশে তথায় মহাদেবের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অপর একটি মন্দিরে কার্ত্তিকেয় ও গণপতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পার্ব্বতীর মন্দির।

ভুবনেশ্বরের বিস্তৃত প্রাঙ্গন; মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মন্দির অবস্থিত; তন্মধ্যে কতকগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। পার্ব্বতীর মন্দির অধিক উচ্চ না হইলেও, কারুকার্য্যে ভুবনেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ। মানব ও ইতর প্রাণীদিগের যে সকল মূর্ত্তি এই মন্দিরের গাত্রে খোদিত রহিয়াছে, তাহাদের নির্ম্মাণের শিল্পচাতুর্য্য ও সৌষ্ঠবের পারিপাট্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এরূপ সুন্দর প্রস্তরখোদিত নর-নারীর প্রতিমূর্ত্তি, প্রাচীন শিল্পকার্য্যে অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কি না, বলিতে পারা যায় না। বঙ্কিম বাবু, ললিতগিরির খোদিত প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিয়া যে কয়েকটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা বলিয়া গিয়াছেন, পার্ব্বতীর মন্দিরের শিল্পকার্য্য দর্শন করিয়া তাহা আমার স্মরণপথে উদিত হইল। তিনি বলিয়াছেন :—

"সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে; চারি পাশে মৃত মহাত্মাদিগের মহীয়সী কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ

করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত, বিকম্পিত-চেলাঞ্চল-প্রবৃদ্ধ-সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি, যাহারা গড়িয়াছে, তাঁহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা, চীনাম্বরা, তরলিত-রত্ন-হারা, পীবরযৌবনভারাবনত-দেহা

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী।
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণী প্রেক্ষণা নিম্নাভিঃ॥

এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল—উপনিষদ্, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল বেদান্ত, বৈশেষিক—এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি, এ পুতুল কোন ছার! তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"

পার্ব্বতীর মন্দিরের প্রস্তরময় গাত্রে যে সকল মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, কালের অপ্রতিহত প্রতাপে ও ধর্ম্মবিপ্লব হেতু তাহারা বিরূপ ও ভগ্ন হইলেও, তাহাদিগের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌষ্টব ও সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া শিল্পীর সূক্ষ্মদৃষ্টি, সত্যনিষ্ঠা ও কার্য্যকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। প্রাচীন ভারতরমণীগণের বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি যেরূপ সূক্ষ্মভাবে খোদিত করা হইয়াছে, অশ্বারোহী যোদ্ধবর্গের বেশভূষার পারিপাট্য ও গতিবিধি যেরূপ নৈপুণ্যের সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, বহু আড়ম্বরে সজ্জিত হস্তী-গুলিকে যেরূপ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করা হইয়াছে—স্তম্ভ, কার্ণিস, গবাক্ষ প্রভৃতির গঠনে যেরূপ সূক্ষ্ম রচনাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে;
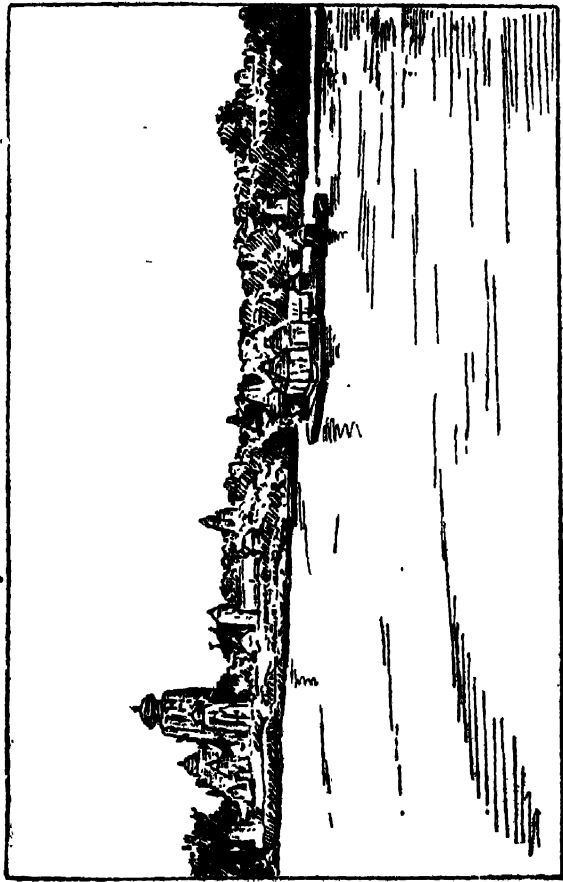
বিন্দুসরোবর—ভুবনেশ্বর।

তাহা দেখিলে প্রাচীন ভারতে প্রস্তর-শিল্পবিজ্ঞান যে অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বহির্ভাগে বহু বিস্তৃত বিন্দু-সরোবর অবস্থিত। ভক্তগণ বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গমন করেন। উড়িষ্যার দেবস্থানের পুষ্করিণীগুলি বড়ই সুন্দর; প্রায় সমস্তগুলিই বহুবিস্তৃত এবং চতুঃপার্শ্বই প্রস্তর বা ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত। প্রায় সকল গুলিরই মধ্যস্থলে এক একটী দেবালয় অবস্থিত। প্রবাদ এই যে, জগতে যতগুলি পবিত্র তীর্থ আছে, তাহাদিগের বিন্দু লইয়াই বিন্দুসরোবর নির্ম্মিত হইয়াছিল। পার্ব্বতী এইস্থানে গোপকন্যার বেশে গোচারণ করিতেন এবং গো-দুগ্ধ দ্বারা লিঙ্গাকার মহাদেবকে স্নান করাইতেন। বিন্দু-সরোবরে তাঁহার গো-কুল স্নান করিত ও উহার জল পান করিত। বিন্দুসরোবর যে অতিশয় প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিন্দুসরোবর।

এক সময়ে বিন্দুসরোবরের চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল। এক্ষণে উত্তর দিকের গাঁথনি একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের সোপানাবলীর অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিন্দুসরোবরের নীচে কয়েকটী প্রস্রবণ আছে, সেই সকল প্রস্রবণ হইতে ইহাতে জল সঞ্চিত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ বিন্দুসরোবরে শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিন্দুসরোবরের জল দেখিতে পরিষ্কৃত। তীরে দুই এক খানি নৌকা বাঁধা থাকিতে দেখা যায়।

পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে পাণ্ডাদিগের ঘর। পূর্ব্ব দিকে মণিকর্ণিকা ঘাটের উপর তীর্থেশ্বর ও অনন্ত-বাসুদেবের মন্দির অবস্থিত। অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরে কৃষ্ণবলরামের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বলরামের

অনন্তবাসুদেবের মন্দির।

মস্তকের উপরে অনন্তের বহুশিরোমণ্ডিত ফণা ছত্ররূপে বিরাজ করিতেছে। বাসুদেবের কৃষ্ণমূর্ত্তি। কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে এই বাসুদেবই মহাদেবকে বারাণসী হইতে ভুবনেশ্বরে সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ বিন্দুসরোবরে স্নান ও তর্পণ করিয়া প্রথমতঃ অনন্ত-বাসুদেবকে দর্শন করে; পরে ভুবনেশ্বর দর্শন করিতে গমন করে।

ভুবনেশ্বরের "প্রসাদ"।

ভুবনেশ্বরে খাদ্যসামগ্রীর বড় অসুবিধা; যাহা পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগের (বাঙ্গালীদিগের) পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক নহে; এখানে যাত্রীরা প্রসাদের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এখানকার উৎকৃষ্ট প্রসাদকে "পকাল" কহে। ইহা অন্ন, দধি ও মিষ্টান্নের মিশ্রণে উৎপন্ন এবং আস্বাদনে মন্দ নহে। ভুবনেশ্বরে ভাল রসকরা পাওয়া যায়; ইহাকে "কোরা" কহে। ইহা দেখিতে অতি শুভ্রবর্ণ এবং আস্বাদনে উত্তম।

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির। ইহার কারুকার্য্য অতি বিচিত্র। প্রবাদ এই যে, ভুবনেশ্বরের আদেশক্রমে ব্রহ্মার বাসের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মা ইহা নির্ম্মাণ করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, এই মন্দির খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেশরবিংশীয় রাজা উদয়তকের মাতা রাণী কলাবতী ইহা নির্ম্মাণ করেন। এখানে একটি শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরের পশ্চিম দিকে ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত; ভক্তগণের বিশ্বাস যে, এখানে স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়।
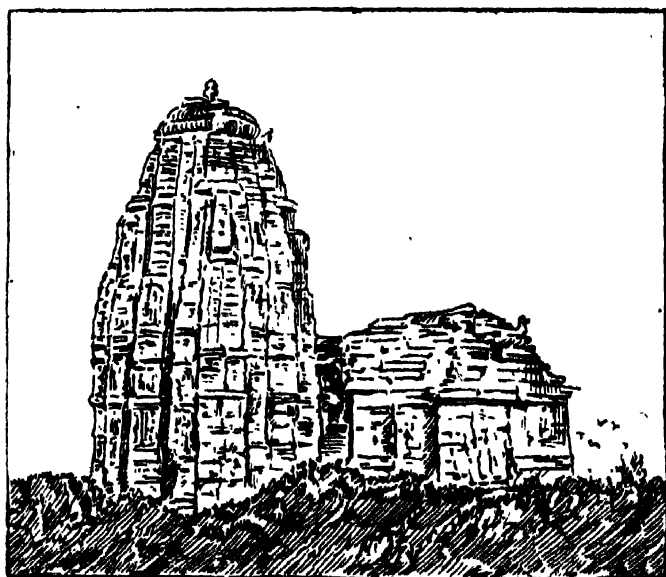
রাজারাণীর মন্দির—ভুবনেশ্বর।

ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের কিছু দূরে ভাস্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এই যে সূর্য্যদেব, বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা এই মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং ইহার মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। ইহার গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহা ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতেও অধিকতর প্রাচীন এবং ইহা পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের একটী মঠ ছিল। ইহার মধ্যে যে শিবলিঙ্গ আছে, তাহা তাঁহাদিগের মতে একটি বৌদ্ধস্তূপের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

ভাস্করেশ্বরের মন্দির।

ভাস্করেশ্বর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে রাজারাণীর মন্দির। ইহা রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত এবং এক সময়ে অতিশয় সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন ছিল। এই মন্দির-মধ্যে কোন দেবমূর্ত্তি নাই; সুতরাং ইহা তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত নহে। কেশরিবংশীয় কোন রাজমহিষীর কর্তৃত্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজারাণীর মন্দির।

রাজারাণীর মন্দিরের অনতিদূরে মুক্তেশ্বরের রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির অবস্থিত। এই স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একটী আম্রকানন ছিল এবং অনেক সাধু সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন। এখানে কয়েকটী প্রস্রবণ আছে।

মুক্তেশ্বরের মন্দির।

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের সন্নিকটে কেদারেশ্বর ও সিদ্ধেশ্বরের মন্দির অবস্থিত এবং অনতিদূরে পরশুরামেশ্বরের মন্দির বিরাজ করিতেছে। মুক্তেশ্বরের মন্দির অপর সকলগুলি অপেক্ষা আকারে ও উচ্চতায় ক্ষুদ্র হইলেও শিল্পকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া উহার স্তম্ভ, খিলান, কার্ণিশ প্রভৃতির নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। পৌরাণিক নানা দেবদেবীর
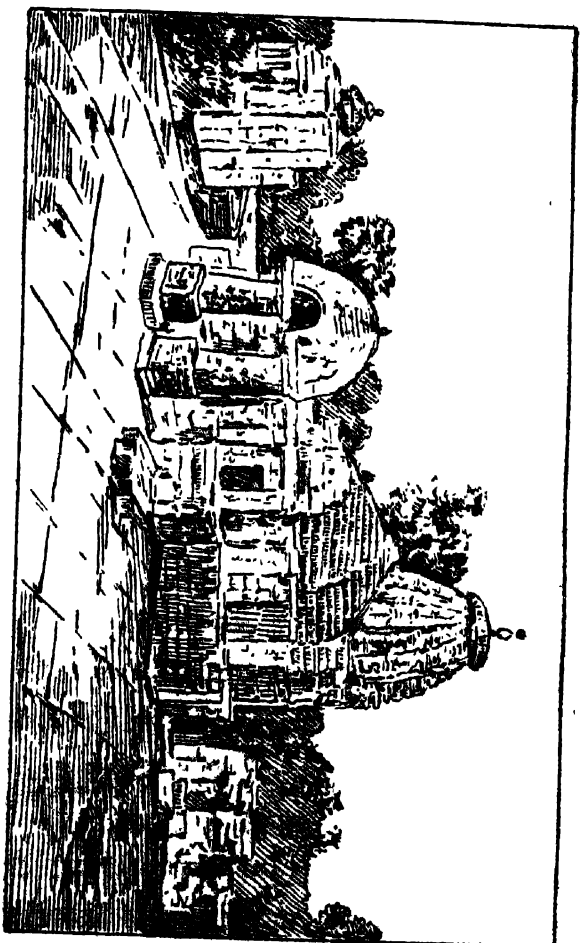
মুক্তেশ্বরের মন্দির—ভুবনেশ্বর।

প্রতিমূর্ত্তি, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশুগণের মূর্ত্তি, নর্ত্তকী ও বাদয়িত্রীগণের আকৃতি অতি সুন্দরভাবে মন্দিরের গাত্রে খোদিত করা হইয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ছাদের শিল্পকার্য্য অতীব সুন্দর।

গৌরীকুণ্ড ও মরীচকুণ্ড।

মুক্তেশ্বরের মন্দিরের নিকটে গৌরীকুণ্ড নামক একটি পুষ্করিণী আছে। ইহার জল অতি স্বচ্ছ এবং ইহার চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। একটী প্রস্রবণের জল নিয়ত পুষ্করিণীর মধ্যে পতিত হইতেছে। পুষ্করিণীর অপর পার্শ্বে সোপানাবলীর মধ্যে একটী ছিদ্র আছে। জল অধিক হইলে ঐ ছিদ্র দ্বারা বহির্গত হইয়া দূরস্থিত নদীর সহিত মিলিত হয়। গৌরী-কুণ্ডের সহিত সংযুক্ত আর একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নাম মরীচকুণ্ড। ইহার জল পান করিলে বন্ধ্যা-দোষ নষ্ট হয়, এইরূপ লোকের বিশ্বাস। পূর্ব্বে এই কারণে পাণ্ডারা এই জল বিক্রয় করিত। এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের আদেশে জল-বিক্রয় বন্ধ হইয়াছে।

কপিলেশ্বর।

ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে কপিলেশ্বর গ্রাম। এই স্থানে কপিলেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। এক সময়ে এই গ্রাম অতিশয় শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ভুবনেশ্বর হইতে কপিলেশ্বর পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহার দুই পার্শ্বে অনেক দোকান ছিল এবং অনেকগুলি দেবমন্দির রাস্তার ধারে অবস্থিত ছিল; তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়। কপিলেশ্বর গ্রামে অনেক লোক বাস করে; গৃহগুলি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, দেওয়ালগুলি চুণকাম করা এবং তদুপরি নানাবিধ চিত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। উড়িষ্যার অধিকাংশ বাটীর বাহিরের দেওয়ালে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত থাকিতে দেখা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, কপিলেশ্বরের মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতেও প্রাচীন। মন্দিরের

অভ্যন্তরে একটি শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মন্দিরের নিকট একটি পুষ্করিণী আছে; ইহার জল, গঙ্গাজল অপেক্ষা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভুবনেশ্বরে আরও যে কত মন্দির আছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। একাম্রপুরাণে উক্ত আছে যে, এই স্থানে এক লক্ষ মন্দির এবং এক কোটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। সংখ্যায় এত অধিক না হইলেও এস্থানে যে বহুসংখ্যক দেব-মন্দির ও শিবলিঙ্গ আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিছুদিন হইল, রামকৃষ্ণ মিশন্ ভুবনেশ্বরে তাঁহাদের একটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর ষ্টেশন্ হইতে মন্দিরে যাইবার বড় রাস্তার ধারে একটী প্রকাণ্ড পুরাতন মন্দিরের সম্মুখে এই আশ্রম অবস্থিত। স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান বলিয়া মিশনের সন্ন্যাসীগণ অনেক সময়ে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে অবস্থান করেন। মঠটী পাকা বিস্তৃত একতল গৃহ। দ্বিতলে একটী মাত্র গৃহে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত স্থানের মধ্যে মঠটী অবস্থিত। ইহা বেশ আরামপ্রদ স্থান। এই মঠের নিকটে দরিদ্র-নারায়ণের সেবার জন্য মিশন্ কর্ত্তৃক একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। নিকটে দুই একজন ভদ্রলোক সম্প্রতি আবাস-বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

ভুবনেশ্বর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক দুইটি ক্ষুদ্র শৈল, প্রাচীন ভারতের জৈন ও বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ অবস্থিত রহিয়াছে। কটকের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ হইতে মহানদীর তীর দিয়া চিল্কা হ্রদ পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক অনুচ্চ শৈলখণ্ড বিরাজ করিতেছে। ইহারা দক্ষিণে পূর্ব্বঘাট-পর্ব্বতমালার সহিত সংযুক্ত। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি এই শৈলশ্রেণীর একাংশ মাত্র। ধবলগিরি ও নীলগিরি নামক অপর দুইটী ক্ষুদ্র শৈল ইহাদিগের সহিত সংযুক্ত আছে। ধবলগিরি সাধারণতঃ ধৌলি নামে পরিচিত। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইহার একাংশে অশোকের একটী শিলালিপি খোদিত আছে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর অতীত হইল, জগৎ-পূজ্য বুদ্ধদেব তিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত পবিত্র নৈতিক ধর্ম্ম কালমাহাত্ম্যবশে হতশ্রী ও ক্ষীণতেজ হইলেও আজিও এই ধর্ম্ম, প্রাচ্য ভূখণ্ডের নানা স্থানে শান্ত জ্যোতিঃ বিকিরণ করিয়া পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা নিবারণ করিতেছে। প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মবিদ্বেষের তাড়নায় ভারতবাসী সেই রাজ-সন্ন্যাসীর প্রদর্শিত মহোচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতনের নিম্নগ সরল পথে সবেগে প্রধাবিত হইতেছে। অপরিহার্য্য কর্ম্মফলের চিত্র তাহাদিগের আত্মসর্ব্বস্ব চিন্তার আবিলময় স্রোতে প্রতিফলিত হইতে সমর্থ হইতেছে না। আজি এই দুর্দ্দশার দিনেও খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির পাষাণময় মূর্ত্তি যেন কালের প্রভাপ অবহেলা করিয়া প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মপ্রাণতা, আত্মসংযম, পরহিতৈষণা ও বৈরাগ্যের অমর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির মধ্যস্থলে একটী অপ্রশস্ত পথ পশ্চিমে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্ব্বতের দুই পার্শ্ব ঘন অরণ্যানী দ্বারা পরিবেষ্টিত। উচ্চশিরঃ ঘনপল্লব-বেষ্টিত তরুরাজি, দূর হইতে দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়া দিগন্তে অবস্থিত নীল শৈলমালার পাদমূলে মিলিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অত্যুন্নত চূড়া দৃষ্টিপথে বিরাজ করিতেছে; মধ্যে অনুর্ব্বর ও অসমতল ভূমি। এক পার্শ্বে নয়নাভিরাম সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদুমারুত-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া দর্শকের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি উৎপাদন করিতেছে। এক অপূর্ব্ব গভীর নিস্তব্ধতা ও বিমল শান্তি সেই পবিত্র স্থানে বিরাজ করিতেছে; কেবল সুকণ্ঠ বিহঙ্গমের কলধ্বনি মধ্যে মধ্যে সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছে। এরূপ শান্তিপূর্ণ স্থান আত্মচিন্তা ও ধর্ম্মসাধনের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী বিবেচনা করিয়া বৌদ্ধমনীষিগণ, ধর্ম্মপ্রচারকরূপ জীবনের গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে এই পবিত্র স্থানে বাস করিয়া আত্মসংযম ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিতেন। এইরূপ কঠোর অভ্যাসের ফলেই তাঁহারা অমানুষিক ক্লেশ-সহিষ্ণুতা, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, চরিত্রের মহত্ব, ত্যাগের পরাকাষ্ঠা এবং ধর্ম্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ ও তৎসন্নিহিত সিংহল এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে এবং চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, মধ্য-এসিয়া, তুরুষ্ক ও পারস্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ও প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মধ্যে কি প্রভেদই দৃষ্টিগোচর হয়! আমরা যে সেই প্রাচীন ভারতবাসীর বংশাবলী, তাহা এক্ষণে কেবল কল্পনা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমাদিগের যেরূপ ধর্ম্মহীন শিক্ষা হইতেছে, তাহার ফলে ক্রমে

অসহিষ্ণুতা, সংকল্পের শিথিলতা, চরিত্রের হীনতা, ত্যাগে পরাঙ্মুখতা এবং কর্ত্তব্যে অনাস্থা ব্যতীত আর অধিক কিছু আশা করা যাইতে পারে না। এক একটী মানুষ লইয়াই জাতি। এরূপ ক্লৈব্য-দুষ্ট লোক লইয়া যে জাতি সংগঠিত, জগতে সম্মান ও শ্রদ্ধার স্থান তাহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া অসম্ভব। জাতি প্রস্তুত করিতে হইলে, তাহার উপাদান-স্বরূপ এক একটী করিয়া মানুষ প্রস্তুত করিতে হইবে। এখনও সময় আছে, এখনও সুবিধা আছে। বস্তু চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ছায়া এখনও দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয় নাই। সঙ্গীত নীরব হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিধ্বনির মধুর নিক্কণ এখনও কর্ণকুহর হইতে অপসৃত হয় নাই। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তাপ এখনও অনুভূত হইতেছে। সূর্য্য পশ্চিম গগনের প্রান্তে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু এখনও রবিকরপ্রদীপ্ত লোহিতশীর্ষ মেঘমালা অস্তমিত দিবাকরের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দৃষ্টান্ত অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। যদি আমরা প্রাচীন ভারতের সেই জগন্মান্য মনীষিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন নিজ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করি, যদি আমরা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের উদার ধর্ম্মে হৃদয়কে বলীয়ান করিয়া বর্ত্তমান ভারতে এক একটী করিয়া মানুষ প্রস্তুত করি, তবেই আবার এই শৌর্য্যবীর্য্য-প্রতিষ্ঠাবিহীন দুর্ব্বল জাতি, প্রাচীন ভারতের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় দিতে সমর্থ হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করা প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের নিজের চেষ্টার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শাস্ত্রোক্ত সদ্দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ দ্বারা নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে হইবে, আত্মসংযম ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে হইবে, পরার্থপরতা শিক্ষা করিতে হইবে, সত্যপ্রিয়তা জীবনের

মূল মন্ত্র করিতে হইবে, হিংসা দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষকে স্নেহ ও সখ্যের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যখন এইরূপ লোক লইয়া এই দুর্ব্বল উপেক্ষিত হিন্দুজাতি পুনর্গঠিত হইবে, তখন ঐশ্বর্য্য বল, ক্ষমতা বল, বিদ্যা বল, স্বাস্থ্য বল, স্বরাজ বল, সকলই আপনা হইতে আসিয়া আমাদিগের করতলগত হইবে। অতএব আমাদিগের যে শক্তিটুকু এখনও অবশিষ্ট আছে, কাল্পনিক আশার প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া তাহা যেন বৃথা অপব্যয় না করি। উহা সদ্বিবেচনার সহিত আত্মোন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইলে অধ্যবসায়শীল ও দূরদর্শী বণিকের মূলধনের ন্যায় ক্রমশঃ পরিসর প্রাপ্ত হইয়া নিজেকে ও জাতিকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবে। আমরা যেন ইহা ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি।

বৈরাগীর মঠ।

খণ্ডগিরির পাদদেশে একখানি ডাক-বাঙলা ও একটী মঠ আছে। ইহা "বৈরাগীর মঠ" নামে পরিচিত। আমি যখন সেখানে গমন করিয়াছিলাম তখন ঐ মঠে এক জন সন্ন্যাসিনী বাস করিতেন। দেখিলাম, মঠের মধ্যে একটী গৃহে বহুসংখ্যক খড়ম সঞ্চিত রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করাতে অবগত হইলাম যে, উহার মধ্যে অনেক সাধু সন্ন্যাসীর, এমন কি চৈতন্যদেব ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণেরও, খড়ম রক্ষিত হইয়াছে। মঠধারিণী এই সকল খড়ম প্রদর্শন করিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

ডাক-বাঙলা।

ডাক-বাঙলাতে দর্শকগণ, আহারাদি ও বিশ্রাম করিয়া থাকেন। এখানে কোনরূপ আহার্য্য দ্রব্য পাওয়া যায় না; খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ডাক-

বাঙলাতে একজন রক্ষক নিযুক্ত আছে, তাহাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার প্রদান করিলেই সঙ্গে লইয়া সে ব্যক্তি "গুম্ফা" সকল দেখাইয়া দেয়।

গুম্ফা।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি উভয় পর্ব্বতই বহুসংখ্যক গুম্ফা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পর্ব্বতের কঠিন গাত্র ভেদ করিয়া এই সকল গুম্ফা প্রস্তুত করা হইয়াছে। এক একটী গুম্ফা নির্ম্মাণ করিতে যে কত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। গুম্ফাগুলির নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে শুদ্ধ বাটালি ও হাতুড়ির দ্বারাই এই বৃহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। গুম্ফাগুলি আকারে ও গঠনে সমান নহে। কতকগুলি গুম্ফা নিতান্ত অনুচ্চ ও অনতিপরিসর, এমন কি তন্মধ্যে এক জন মানুষেরও পা ছড়াইয়া শয়ন করিবার স্থান নাই এবং বসিয়া থাকিলে মস্তক ও গুম্ফার ছাদের মধ্যে অধিক ব্যবধান থাকে না। এই সকল গুম্ফার মধ্যে শিল্পকার্য্যের কোনরূপ পারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে কোনরূপে বাতাতপ হইতে দেহ রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই সকল গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বোধ হয় যেন সেই গুম্ফাবাসিগণ কঠোর শাসন দ্বারা শরীর ও মনকে সংযত করিবার জন্য এইরূপ বাসগৃহের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বৃহদায়তন শিল্পকার্য্যসমন্বিত সৌষ্ঠবসম্পন্ন অপর গুম্ফাগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র গুম্ফাগুলি কঠোর বৈরাগ্যব্রতধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দ্বারা বৌদ্ধযুগের প্রথমাবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ়ভাবে ভারতভূমিতে সংস্থাপিত হইল, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ নানাবিধ লৌকিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মীমাংসার নিমিত্ত সন্ন্যাসীমণ্ডলীর নিকট সর্ব্বদা আগমন করিতে লাগিলেন, শাস্ত্রালোচনা ও প্রচার-

কার্য্যের প্রণালী উদ্ভাবন করিবার নিমিত্ত সন্ন্যাসীদিগের একত্র বাস অথবা সর্ব্বদা সম্মিলিত হইবার প্রয়োজন উপস্থিত হইল, তখন যে সকল গুম্ফা প্রস্তুত হইতে লাগিল, তাহারা পরিসরে বিস্তৃত ও স্বচ্ছন্দতায় সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ করিল। এই শেষোক্ত গুম্ফাগুলি পূর্ব্বোক্ত গুম্ফাসমূহ অপেক্ষা অনেক উচ্চ; ভিতরে দাঁড়াইলে অধিকাংশ স্থলে মস্তক ছাদ স্পর্শ করে না এবং এক একটী গুম্ফার মধ্যে আট দশজন লোক একত্র বাস করিতে পারে। ইহাদিগের প্রায় সকলগুলিরই সম্মুখে একটী করিয়া দালান বিরাজিত এবং প্রত্যেক গুম্ফার ২।৩টী প্রবেশ-দ্বার আছে। দরজার চৌকাটগুলি প্রস্তরময়—কোনটীতেই কবাট নাই, পূর্ব্বে ছিল কি না, তাহাও জানিবার কোন উপায় নাই।

একচ্ছত্র সম্রাট্ অশোকের রাজত্বকালের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ, খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির গুম্ফা-মধ্যে বাস করিতেন। অধিকাংশ গুম্ফাই উদয়গিরির গাত্রে খোদিত এবং এগুলি খণ্ডগিরির গুম্ফা অপেক্ষা সমধিক বৃহৎ ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। উদয়গিরিতে অনেকগুলি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়; খণ্ডগিরিতে দুইটীমাত্র শিলালিপি আছে।

প্রবাদ এই যে খণ্ডগিরি পূর্ব্বে হিমালয়-পর্ব্বতের একটী প্রত্যঙ্গ ছিল এবং উহার গুহামধ্যে প্রাচীন ঋষিগণ বাস করিতেন। সীতা-উদ্ধারের সময় সেতুবন্ধের নিমিত্ত হনুমান এই পর্ব্বত-খণ্ড উৎপাটন করিয়া এই স্থানে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য, ইহা একটী গল্পমাত্র।

রাণী-গুম্ফা।

উদয়গিরির মধ্যে যে সকল গুম্ফা অবস্থিত, তন্মধ্যে রাণীগুম্ফাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কথিত আছে যে, একজন হিন্দু-রাজমহিষী বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া রাজ্যসুখ

পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর বেশে এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন এজন্য ইহা রাণী-গুম্ফা নামে অভিহিত। রাণী-গুম্ফা দ্বিতল; গৃহগুলি একটী বিস্তৃত প্রাঙ্গণের তিনপার্শ্বে অবস্থিত, প্রাঙ্গণের এক দিক্ সম্পূর্ণ মুক্ত। প্রাঙ্গণটী পর্ব্বতের গাত্রে সমতল ও বিস্তৃত একখণ্ড ভূমিমাত্র।

গৃহগুলি দ্বিতলবৎ প্রতীয়মান হইলেও একটী অপরটীর উপর অবস্থিত নহে। উপরিতলের গৃহগুলি নিম্নতলের গৃহের কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ভাগে পর্ব্বতের উচ্চাংশে অবস্থিত,—এজন্য দূর হইতে এই গুম্ফাটী দ্বিতল বলিয়া বোধ হয়। নিম্নতলের মধ্যভাগে তিনটী ও দুইপার্শ্বে পাঁচটী গৃহ অবস্থিত, উপরিতলের মধ্যভাগে চারিটী এবং উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া গৃহ সংস্থিত। গৃহগুলির সম্মুখে একটী করিয়া বারাণ্ডা কতকগুলি স্তম্ভের উপর বিরাজ করিতেছে, বারাণ্ডার ছাদ, গৃহের ছাদ অপেক্ষা অধিক উচ্চ। প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করিবার ২।৩টী দরজা আছে। দরজার চৌকাটগুলি প্রস্তর হইতে সুন্দররূপে খোদিত করিয়া বাহির করা হইয়াছে। প্রবেশ-দ্বারগুলির শীর্ষদেশ গোল খিলান দ্বারা শোভিত, চৌকাটের মস্তকে এবং খিলানের উপরে বিবিধ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির মধ্যে সিংহ, হস্তী এবং নর-নারীর মূর্ত্তির সংখ্যাই অধিক। অধিকাংশ নর-নারীর মূর্ত্তিগুলি উপাসনার ভাবে সংস্থিত। এতদ্ব্যতীত কোন একটী বিশেষ ঘটনার ধারাবাহিক চিত্র; খিলানগুলির উপর খোদিত রহিয়াছে; গণেশ-গুম্ফা-বর্ণনার সময়ে এবিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে। নিম্নতলের বারাণ্ডার দুইপার্শ্বে দুইটী প্রস্তরময় বৃহৎ দৌবারিক মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে; ইহাদিগের মধ্যে একটীর অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অপরটীর অবস্থা মন্দ নহে। বারাণ্ডার অপর স্থানে আর দুইটী

রাণী-গুম্ফা—উদয়গিরি।
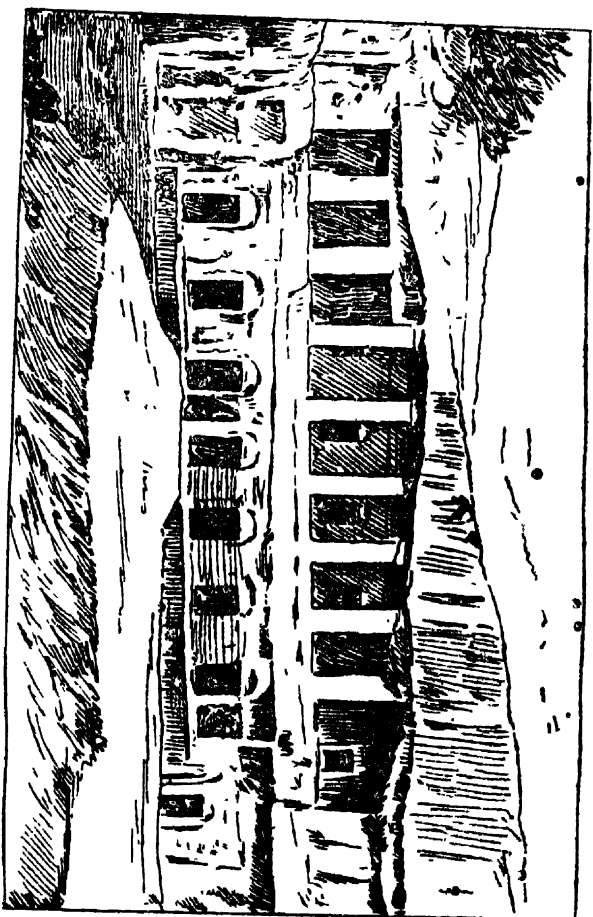
মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদিগের মধ্যে একটীর যোদ্ধৃবেশ। কিঞ্চিৎ দূরে একটী বৃহৎ সিংহের উপর একটী নারীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

নিম্নতলের বারাণ্ডা, উপরের বারাণ্ডা অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত। উপরের বারাণ্ডা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪২ হাত; উহার ছাদ ১১টী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। স্তম্ভগুলির মধ্যে অধিকাংশই এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কোন কোন গৃহের তিন পার্শ্বে বেদীর ন্যায় উচ্চ প্রস্তরময় বসিবার আসন দৃষ্ট হয়।

গণেশ-গুম্ফা।

উদয়গিরির শিখরপ্রদেশে এবং রাণী-গুম্ফার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে আর একটী গুম্ফা অবস্থিত, ইহার নাম গণেশ-গুম্ফা। ইহা রাণী-গুম্ফার ন্যায় দ্বিতল নহে। ইহাতে দুইটী গৃহ ও সম্মুখে একটি বারাণ্ডা আছে; বারাণ্ডার ছাদ ৫টী স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। স্তম্ভগুলি ভগ্নপ্রায়। স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশে কতকগুলি নারীমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। গুম্ফায় উঠিবার সোপানাবলীর দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহদাকার প্রস্তরের হস্তিমূর্ত্তি সংস্থাপিত; প্রত্যেক হস্তী শুণ্ড দ্বারা একটি নাল-সমেত পদ্ম ধারণ করিয়া রহিয়াছে। হস্তীগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি যে সময় উদয় গিরিতে গিয়াছিলাম, তখন গভর্ণমেণ্টের আদেশে গুম্ফা ও তন্মধ্যস্থিত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিগুলির সংস্কার সাধিত হইতেছিল।

গণেশ-গুম্ফার মধ্যে গণেশের প্রতিমূর্ত্তি নাই। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তরময় হস্তি-মুণ্ড সংস্থাপিত রহিয়াছে। ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, এতগুলি হস্তিমূর্ত্তি থাকিবার জন্যই এই গুম্ফা, গণেশের নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই গুম্ফার প্রবেশ-দ্বারের গোল খিলানের উপর কোন বীর পুরুষ দ্বারা একটী রমণী-হরণ-ব্যাপারের ধারাবাহিক চিত্র খোদিত রহিয়াছে। স্থানীয়

লোকের বিশ্বাস এই যে, রাক্ষসাধিপতি রাবণের সীতাহরণ-বৃত্তান্ত এই চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্যার উইলিয়ম্ হণ্টরের মতে এ অনুমান একেবারেই ভিত্তিহীন। বাস্তবিক রাবণের সীতা-হরণ-সম্বন্ধে আমরা যে চিত্র রামায়ণে দেখিতে পাই, তাহার সহিত কোন অংশে ইহার সাদৃশ্য নাই। রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে কতকগুলি যোদ্ধৃবেশধারী মানবের সহিত একটী যুদ্ধের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে এবং যুদ্ধাবসানে পূর্ব্বোক্ত বীরপুরুষ, বিহ্বলা রমণীকে একটী হস্তীর উপর উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিতেছেন। এরূপ ঘটনার চিত্র রামায়ণে নাই। সীতাহরণ সময়ে পথে দশমুণ্ড রাবণের সহিত পক্ষিরাজ জটায়ুর যুদ্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধাবসানে সীতাদেবী, পুষ্পক-রথে উত্তোলিত হইয়া লঙ্কায় নীত হইয়াছিলেন—সুতরাং উক্ত ঘটনার সহিত এই চিত্রের কোন সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ, চিত্রের শেষাংশ দেখিলে ইহা যে সীতা-হরণের চিত্র নহে, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। চিত্রের শেষ ভাগে অপহারকের সহিত অপহৃতা রমণীর বিবাহ বা মিলন স্পষ্টরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে. সুতরাং ইহা যে রামায়ণঘটিত চিত্র নহে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার একবার মনে হইয়াছিল যে, হয় তো ইহা রুক্মিণীহরণ বা সুভদ্রা-হরণের চিত্র হইলেও হইতে পারে; উভয় ব্যাপারে স্বয়ম্বরে সমবেত রাজন্য-বর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং বিবাহোৎসবে এই উভয় অভিনয়ই সমাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্যান্য প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণ, চিত্রের ভাব দেখিয়া অপহৃতা রমণীকে পরিণীতা বলিয়া অনুমান করেন। বিশেষতঃ পুরাণোক্ত উভয় ব্যাপারেই অশ্বযুক্ত রথ, যান-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল; সুতরাং এই চিত্র উপরিলিখিত কোন ঘটনারই প্রতিফলন বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেব, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া আনেন এবং পরে তাঁহার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন— এই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ, গণেশ-গুম্ফার খিলানের উপরে খোদিত হইয়াছে। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই অনুমান ভ্রমাত্মক, বলিয়া সপ্রমাণ হইবে। পুরুষোত্তম দেব, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু গণেশ-গুম্ফার চিত্র খৃষ্ট জন্মিবার অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে খোদিত হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাণীগুম্ফাতেও ঠিক এইরূপ একটি চিত্র খোদিত আছে। বোধ হয় উভয় চিত্রই তৎকালিক কোন একটি প্রসিদ্ধ সামাজিক ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোদিত হইয়াছিল, কারণ দুইটি চিত্রের মধ্যে কোন কোন অংশে কিঞ্চিৎ প্রভেদ লক্ষিত হয়।

স্বর্গপুরী-গুম্ফা।

রাণী-গুম্ফার পশ্চিমে আর একটি দ্বিতল গুম্ফা অবস্থিত আছে, ইহার নাম স্বর্গপুরী। ইহা রাণী-গুম্ফা অপেক্ষা পরিসরে অনেক ক্ষুদ্র ও সৌষ্ঠবেও অনেক নিকৃষ্ট। ইহার উপরে ও নীচের তলে দুইটি করিয়া গৃহ ও সম্মুখে একটি বারাণ্ডা আছে, বারাণ্ডার স্তম্ভগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কয়েকটী হস্তীর প্রতিমূর্ত্তি অতি সুন্দর ভাবে এই গুম্ফার মধ্যে খোদিত রহিয়াছে।

জয়া-বিজয়া গুম্ফা।

স্বর্গপুরীর বামে জয়া-বিজয়া গুম্ফা; ইহার মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র গৃহ ও একটি বারাণ্ডা আছে। এই গুম্ফায় একটি বোধিবৃক্ষ ও তাহার দুই পার্শ্বে উপাসনার ভাবে অবস্থিত দুইটী মনুষ্যের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

স্বর্গপুরীর নিকটে দ্বারকাপুর, মর্ত্ত্যলোক, মাণিকপুর, বৈকুণ্ঠ, পাতালপুর, যমপুর প্রভৃতি অপর অনেকগুলি গুম্ফা অবস্থিত। বৈকুণ্ঠ, রাণী-গুম্ফার ন্যায় দ্বিতল; কিন্তু পরিসরে ক্ষুদ্র। ইহার নিম্ন-তল-ভাগ, পাতালপুর নামে অভিহিত। পাতালপুরের পশ্চিমে যমপুর নামক একটী গুম্ফার ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। দৌবারিক-বেশধারী একটী প্রকাণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি যমপুরের দ্বার রক্ষা করিতেছে। বৈকুণ্ঠ গুম্ফায় পালি ভাষায় কতকগুলি কথা খোদিত আছে। প্রিন্সেপ (Princep) সাহেব তাহার এইরূপ অর্থ করেন, যথা—

বৈকুণ্ঠ ও যমপুর-গুম্ফা।

"কলিঙ্গ-রাজগণ, অর্হৎগণের আশীর্ব্বাদে এই সকল গুম্ফা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।"

বৈকুণ্ঠের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এবং পর্ব্বতের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধ-প্রদেশে হস্তি-গুম্ফা-নামে আর একটী বৃহৎ গুম্ফা অবস্থিত আছে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে, জৈনরাজ খারবেল কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একটী স্বাভাবিক গুহাকে কাটিয়া বিস্তৃত করিয়া ইহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই গুম্ফায় ৩টী গৃহ এবং গৃহের সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে; ইহাতে শিল্পকার্য্য-সম্বন্ধে প্রশংসাযোগ্য কিছুই নাই। ইহার শীর্ষদেশে প্রাচীন অক্ষরে একটী বৃহৎ শিলালিপি খোদিত রহিয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, "ইহাই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন শিলালিপি। এক্ষণে এই শিলালিপির অধিকাংশই নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং অনেক স্থানেই ইহা নিতান্ত অস্পষ্ট। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কিটো ইহার একটী প্রতিলিপি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই কারণেই

হস্তি-গুম্ফা।

ইহা ইতিহাসের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই লিপিপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ঐর নামক অতি পরাক্রান্ত কলিঙ্গদেশের নরপতি দ্বারা এই গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহামেঘ নামক একটী প্রকাণ্ড হস্তী তাঁহার বাহন ছিল; তিনি বারাণসীতে প্রচুর স্বর্ণ বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দানশীলতা অসীম। তিনি অসংখ্য সৈন্য, অশ্ব, বারণ, গো, মেষ, মহিষাদির দ্বারা সর্ব্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। কলিঙ্গ-রাজ্য জয় করিয়া তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে কোন পর্ব্বতরাজের দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি ধর্ম্মমণ্ডলীর নিমিত্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্তম্ভ-শোভিত চৈত্য ও সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি মগধের অধিপতি নন্দরাজকে পরাভব করিয়া মগধের সিংহাসনে নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই লিপি দ্বারা অনুমান করেন যে, ঐর নরপতি খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১৬ হইতে ২১৬ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে কলিঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই শাসন সময়ে এই হস্তি-গুম্ফা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সর্প-গুম্ফা ও ব্যাঘ্র-গুম্ফা।

হস্তি-গুম্ফার সন্নিকটে পাবন-গুম্ফা, সর্প-গুম্ফা, জজন-গুম্ফা, অলকপুর-গুম্ফা, ব্যাঘ্র-গুম্ফা, ঊর্দ্ধবাহু-গুম্ফা, প্রভৃতি অপর কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুম্ফা অবস্থিত আছে। সর্প গুম্ফার শীর্ষদেশে একটী ত্রিশিরঃ অজগর সর্পের মস্তক খোদিত রহিয়াছে। ব্যাঘ্র-গুম্ফার প্রবেশদ্বারে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্রের মস্তক মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে।

খণ্ডগিরিতে যে সকল গুম্ফা আছে, তন্মধ্যে অনন্ত-গুম্ফা, জৈন-গুম্ফা এবং ললাটেন্দুকেশরী-গুম্ফাই সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ব্যতীত এই পর্ব্বতের

শীর্ষদেশে একটী জৈন দেবমন্দির, প্রতিষ্ঠিত আছে। খণ্ডগিরির উপরে অবস্থিত দেবসভা ও আকাশগঙ্গা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অনন্ত গুম্ফা।

অনন্ত-গুম্ফায় দুইটী গৃহ ও সম্মুখে একটী বারাণ্ডা আছে। তিনটী স্তম্ভের উপর বারাণ্ডার ছাদ অবস্থিত। গৃহের মধ্যে দেওয়ালে একটী বুদ্ধ-প্রতিমূর্ত্তি এবং খিলানগুলির উপর কতকগুলি নর-নারীর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। খিলানগুলির মধ্যস্থলে একটী মহালক্ষ্মীমূর্ত্তি বিরাজমান—পদ্মবনে কমলা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন, দুইপার্শ্বে দুইটী হস্তী শুণ্ড উত্তোলন করিয়া যেন তাঁহার মস্তকে জলধারা বর্ষণ করিতেছে। বৌদ্ধগুম্ফার মধ্যে এই হিন্দুদেবীমূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তি সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির সূচক, এইজন্য ইনি উপাসিতা না হইয়াও বৌদ্ধরচিত গুম্ফার মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈনেরা মহালক্ষ্মীর মূর্ত্তির প্রতি যে সাতিশয় শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, নানা স্থানে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনন্ত-গুম্ফা হইতে কিছু দূরে অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র গুম্ফা অবস্থিত আছে। এই স্থানে নাগরী অক্ষরে লিখিত একটী শিলালিপি দৃষ্ট হয়। লিপি দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, এই সকল গুম্ফার মধ্যে আচার্য্য কলচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্য বেলচন্দ্র বাস করিতেন।

জৈন-গুম্ফা।

খণ্ডগিরির পূর্ব্ব প্রান্তে জৈন-গুম্ফা অবস্থিত। দুইটী বৃহৎ গৃহ ও স্তম্ভশোভিত একটী বারাণ্ডা লইয়া এই গুম্ফা গঠিত। গৃহের পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালে কতকগুলি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি এবং নগ্ন "মহাবীরের" দণ্ডায়মান মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে।

খণ্ডগিরির শিখর-দেশে অবস্থিত জৈন-মন্দির শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পর্ব্বতের শিখর-প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া এই মন্দিরের চূড়া, অনেক দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার মধ্যে মহাবীরের নগ্ন দণ্ডায়মান মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখের পর্ব্বতাংশ, সমতল ভাবে কর্ত্তিত হইয়া প্রাঙ্গনে পরিণত হইয়াছে। জৈনেরা এই স্থানে বসিয়া উপাসনা করিতেন। এক্ষণে মন্দিরে রীতিমত পূজা হয় না; মধ্যে মধ্যে জৈন তীর্থযাত্রিগণ এই স্থানে আগমন করিয়া পূজা ও উৎসব করিয়া থাকেন।

জৈন-মন্দির।

জৈন-মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পর্ব্বতাংশের ভূমি সমতল ও বহু বিস্তৃত। এই স্থানে দেব-সভা অবস্থিত রহিয়াছে। বহুসংখ্যক অনুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ লইয়া দেব-সভা গঠিত। মধ্যস্থানের স্তম্ভটি অধিকতর উচ্চ ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই স্থানে বৌদ্ধমণ্ডলী একত্র সম্মিলিত হইয়া ধর্ম্ম-বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

দেব-সভা।

দেবসভার পূর্ব্বদিকে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ প্রস্তরগ্রথিত পুষ্করিণী অবস্থিত রহিয়াছে; ইহার নাম আকাশগঙ্গা। একটি প্রস্রবণের সহিত ইহার সংযোগ আছে। অবতরণের নিমিত্ত প্রস্তরময় সোপানাবলী আছে; সংস্কারাভাবে ইহার জল নিতান্ত অপরিষ্কৃত রহিয়াছে দেখিলাম।

আকাশ-গঙ্গা।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে ললাটেন্দু-কেশরী-গুম্ফার মধ্যে ঐ নামধেয় নৃপতির সমাধি হইয়াছিল।

——()*()——

ভুবনেশ্বর পার হইয়া খুরদা রোড জংশন্ ষ্টেশন। মাদ্রাজ মেল গাড়ীতে উঠিলে এই স্থানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া পুরী গমন করিতে হয়। পুরী এক্স্‌প্রেস্ বা প্যাসেঞ্জারে আসিলে গাড়ী বদল করিবার আবশ্যক হয় না। মাদ্রাজ মেল গাড়ী এই ষ্টেশন হইতে দক্ষিণ মুখে চিল্কা হ্রদ ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল বাহিয়া মাদ্রাজাভিমুখে গমন করে। পুরীর রাজাই খুরদার রাজা নামে সকলের নিকট পরিচিত। ইহা পুরীর একটী সব্ ডিভিসন্। খুর্‌দার কাছারি গৃহ ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে অবস্থিত।

খুর্‌দা।

রাজা মুকুন্দদেবের বংশাবলী, মুসলমানদিগের অধীন করদ-রাজ-রূপে এই স্থানে বাস করিতেন এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক পুরীর মন্দিরের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেই অবধি খুর্‌দার রাজা জগন্নাথ দেবের প্রধান সেবায়েৎ। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় ইনি স্বহস্তে গোময় ছিটাইয়া সুবর্ণনির্ম্মিত সম্মার্জ্জনী দ্বারা জগন্নাথ-দেবের গমনের পথ পরিস্কার করিয়া থাকেন। স্থানীয় ভাষায় এই কার্য্যকে "ছেরাপোরা" কহে। এই কার্য্য-সম্বন্ধে উড়িষ্যা দেশে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কটকাধিরাজ বিখ্যাত পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীপুরাধিপতির কন্যা পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইয়া তথায় দূত প্রেরণ করিলে কাঞ্চীপুরাধিপতি "ছেরাপোরা"রূপ নীচ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকে কন্যা দান করিতে অস্বীকৃত হইয়া দূতের অবমাননা করিয়াছিলেন। ইহাতে পুরুষোত্তম দেব সসৈন্যে কাঞ্চীপুর গমন করিয়া উক্ত নগর অধিকার করেন এবং রাজাকে হত্যা করিয়া তদীয় কন্যা

পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া পুরীতে প্রত্যাগমন করেন। কাঞ্চীপুরাধিপ কর্ত্তৃক অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত তিনি পদ্মাবতীকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের কোন ঝাড়ুবর্দারের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিতে মন্ত্রীকে আদেশ প্রদান করেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পদ্মাবতীকে নিজ বাস ভবনে তৎকালে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ দূরদর্শী মন্ত্রী সহসা রাজার আদেশ পালন না করিয়া রাজকন্যা যাহাতে বংশ ও মর্য্যাদা অনুযায়ী উপযুক্ত পাত্রে সমর্পিতা হয়েন, তাহারই সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে জগন্নাথ দেবের রথ-যাত্রার দিন সমাগত হইল। রাজা পুরুষোত্তম দেব, চিরন্তন কুল-প্রথানুসারে রথগমনের পথ গোময় ও সম্মার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রী রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং করযোড়ে রাজ-সমীপে নিবেদন করিলেন—'মহারাজ! আপনার আদেশ মত, যিনি এক্ষণে জগন্নাথ দেবের ঝাড়ু-বরদারের কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারই হস্তে রাজকন্যা পদ্মাবতীকে সমর্পণ করিলাম।" রাজা মন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া রাজকুমারী পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন।

খুরদায় উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্ত্তি চিহ্ন কিছু মাত্র নাই। বারুণী দেবীর একটী ক্ষুদ্র মন্দির এখানে অবস্থিত আছে। এই স্থানটী চতুর্দ্দিকে শৈলমালায় পরিবেষ্টিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর। এই স্থানের জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর।

সত্যবাদী ও সাক্ষী-গোপাল।

খুরদা রোড্ জংশন্ পার হইয়া পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল উত্তরে সত্যবাদী নামক গ্রামে সাক্ষী-গোপালের মন্দির অবস্থিত। সাক্ষী-গোপাল নামক ষ্টেশনে নামিয়া এই মন্দির দর্শন করিতে যাইতে হয়।

মন্দিরটী ষ্টেশন হইতে অধিক দূর নহে, সহজেই পদব্রজে যাইতে পারা যায়। স্ত্রীলোকদিগের জন্য গো-যানের বন্দোবস্ত হইতে পারে।

সাক্ষী-গোপাল সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। এক সময়ে কাঞ্চী প্রদেশের অন্তর্গত বিদ্যানগরে দুই জন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এক জন বয়োবৃদ্ধ এবং কুল, মর্য্যাদা ও বিদ্যায় অপরের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অপরটী যুবা পুরুষ। দুই জনে একত্র হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। সেই সময়ে যুবক ব্রাহ্মণ প্রাণপণ যত্নে বৃদ্ধের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আরোগ্য লাভ করিয়া গোপালজীর সম্মুখে সেবাকারী ব্রাহ্মণকে পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার কন্যা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ, উক্ত ব্রাহ্মণ-যুবকের কুল, শীল ও বিভবের হীনতা হেতু এই বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালনে অস্বীকৃত হইলেন। তখন সেবাকারী ব্রাহ্মণ নিতান্ত ক্ষুন্নমনাঃ হইয়া—"গোপালজীর সাক্ষাতে এই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল"—এই কথা বলাতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার আত্মীয়গণ উপহাস করিয়া কহিলেন যে, যদি গোপালজী স্বয়ং আসিয়া এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তবে তাঁহারা তাহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিবেন। যুবকের গোপালজীর উপর অবিচলিত ভক্তি ছিল। তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক বৃন্দাবনে পুনরাগমন করিলেন। গোপাল তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহার সহিত দক্ষিণাপথে গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তাঁহার পশ্চাদগমন করিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিবেন না। যদি ফিরিয়া

দেখেন, তাহা হইলে গোপাল সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন, আর অধিক দূর অগ্রসর হইবেন না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কিরূপে জানিতে পারিবেন যে, গোপাল তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিতেছেন। তাহাতে গোপাল উত্তর করেন যে, ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণের নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইবেন। এইরূপে বহু পথ অতিক্রম করিয়া দুই জনে কাঞ্চীপুরের নিকট এক বালুকাময় প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইস্থানে প্রান্তরের বালুকা, গোপালের নূপুরের মধ্যে প্রবেশ করাতে নূপুর-ধ্বনি নীরব হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ব্যস্ত ও ভীত হইয়া পশ্চাদ্দিকে চাহিবামাত্র, গোপাল পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞামত সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন, আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না। এই অদ্ভুত ব্যাপার নাগরিকদিগের কর্ণগোচর হইলে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য লোকেরা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং গোপালকে সাক্ষিরূপে উপস্থিত দেখিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিতান্ত লজ্জিত হইয়া যুবক ব্রাহ্মণের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিলেন। কাঞ্চী প্রদেশের রাজা সেই স্থানে গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া যথাবিধি সেবার বন্দোবস্ত করিলেন।

যখন পুরুষোত্তম দেব কাঞ্চীপুর জয় করেন, তখন তিনি গোপালকে আনয়ন করিয়া পুরীর নিকট স্থাপন করেন এবং বোধ হয় সেই সময়ে একটি রাধিকামূর্ত্তি গোপালের পার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুই ব্রাহ্মণ, বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্র নামে প্রসিদ্ধ এবং যে ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে সাক্ষীগোপালের সেবার কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ দুই ব্রাহ্মণের বংশাবলী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

এই ঘটনা হইতে সাক্ষীগোপালের অপর নাম সত্যবাদী গোপাল এবং যে গ্রামে মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম সত্যবাদী। গুপ্তবৃন্দাবন

নামক এক অতি মনোরম বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যে সাক্ষীগোপালের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে উচ্চ অখণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী স্তম্ভ বিরাজ করিতেছে। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী এবং পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দেবমন্দির আছে; এখানে সাক্ষীগোপালের চন্দনযাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। জগন্নাথের ন্যায় গোপালের সিদ্ধান্ন ভোগ নাই; ভোগের নিমিত্ত মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে। খই-চূর্ণ চিনিতে পাক করিয়া গোপালের ভোগের জন্য প্রদত্ত হয়। সাক্ষীগোপালে অতি সুন্দর কলা পাওয়া যায়।

যাত্রীরা পুরী হইতে প্রত্যাগমনের সময় সাক্ষীগোপাল দর্শন করিতে গমন করে। তাহারা যে পুরী গমন করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ-স্বরূপ পাণ্ডাদিগের হস্তলিখিত এক খণ্ড লিপি লইয়া সত্যবাদী গোপালকে অর্পণ করে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, এইরূপ করিলে সত্যবাদী গোপাল তাহাদিগের পুরী গমনের যথার্থতা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

সাক্ষীগোপাল পার হইইয়া মালতীপুর ষ্টেশন এবং তৎপরে আঠার নালার সেতু। এই সেতু পার হইলেই পুরী সহরের উপকণ্ঠে উপনীত হওয়া যায়।

আঠার নালা।

আঠার নালার সেতু, মধুপুর বা মুটিয়া নদীর উপর অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ শত হস্ত এবং ১৮টী বিস্তৃত খিলানের উপর সংস্থিত। রক্ত-প্রস্তর-নির্ম্মিত ১৯টী সুবৃহৎ স্তম্ভ, খিলানগুলির ভার বহন করিতেছে। ১৮টী "ফোকর" আছে বলিয়া এই সেতু আঠারনালা নামে অভিহিত। ইহা একটী প্রাচীন হিন্দু-কীর্ত্তি। ১০৩৪ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা মৎস্যকেশরী, এই সেতু নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও আজি পর্য্যন্ত ইহা সুদৃঢ় ও অভগ্ন অবস্থায় রহিয়াছে। এই সেতুর উপর দিয়া ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছে। ইহা 'জগন্নাথ-সড়কের' উপর অবস্থিত; সুতরাং যাহারা পদব্রজে পুরী গমন করে, তাহাদিগকে সেই সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। রেলওয়ে কোম্পানী এই সেতুর অনতিদূরে আর একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে; তাহারই উপর দিয়া রেলগাড়ী গমন করে। আঠার নালার নির্ম্মাণ-সম্বন্ধে দুইটী গল্প প্রচলিত আছে। একটী গল্প এই যে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন—যিনি পুরীতে দারুব্রহ্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন—এই খরস্রোতা নদীর উপর সেতু বন্ধন করিতে বারংবার বিফলমনোরথ হইলে, নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সন্তোষের নিমিত্ত একে একে নিজের

অষ্টাদশ পুত্রকে বলি প্রদান করিয়া আঠারটি খিলান প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অপর গল্প এই যে, যখন চৈতন্য দেব পুরুষোত্তমে গমন করেন, তখন তিনি খরস্রোতা মধুপুর নদী পার হইতে উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা তীরে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জগন্নাথ দেব তাঁহার আগমন-বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া রাত্রির মধ্যেই নদীর উপর সেতু-নির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিলেন। রাত্রি প্রভাতে চৈতন্যদেব এই সেতু পার হইয়া প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই সকল গল্পের মূলে কোন সত্য নাই, তবে আজি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানাস্থানে, নরবলি না হইলে সেতু-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, এই কুসংস্কার অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রবল দেখিতে পাওয়া যায়।

আঠারনালা হইতে শ্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা, স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে পাণ্ডারা যাত্রীদিগের নিকট হইতে ধ্বজা-দর্শনীবাবদে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিত। শুদ্ধ শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়াই যাত্রীরা যে কি অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে, তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। অনাহার, অনিদ্রা, অভাব, দারুণ পথকষ্ট, রোগ, শোক, ভয়, ভাবনা—এ সকলই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত বিস্মৃত হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় আত্মহারা হইয়া তাহারা অনিমেষ লোচনে ধ্বজার দিকে চাহিয়া থাকে এবং ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ দেবের পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কার করিতে থাকে। যে ঈপ্সিতের দর্শনা-ভিলাষের বাসনা আজীবন হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিল, আজি তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদিগের হৃদয়, আশা ও

আনন্দের তরঙ্গে কিরূপ উদ্বেলিত হইতে থাকে, তাহা ভক্ত ভিন্ন অপর কাহারও বুঝিবার বা বুঝাইবার শক্তি নাই।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ! মানস নেত্রে ভক্তিভাবে শ্রীমন্দিরের পবিত্র ধ্বজা দর্শন করিয়া দেব-দর্শনের পূর্ব্বে যথারীতি সংযম পালন করিবার অভিপ্রায়ে আপনাদিগকে এই স্থানে স্বল্পাবকাশ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পুরীধামে।

(১)

১৭ই মে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আমরা পুরী পৌঁছিলাম। রেল-গাড়ী হইতে নামিয়া স্বনামখ্যাত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ (অধুনা স্বর্গগত) রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের "শশিনিকেতন" নামক সাগর-তীরবর্ত্তী প্রাসাদে মালপত্রাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া সস্ত্রীক "ধূলা পায়ে" ঠাকুর দেখিতে শ্রীমন্দিরে গমন করিলাম। দর্শনাদি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে বেলা প্রায় তিনটা হইল। সে দিন সমুদ্রে স্নান হইল না। বাড়ীতেই স্নান করিয়া সপরিবারে জগন্নাথের ভোগ তৃপ্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম।

রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর।

আমি যখন প্রথম পুরী গিয়াছিলাম, তখন রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর কটকের সরকারী উকীল ছিলেন। তিনি এক জন অতি বিচক্ষণ, বহুদর্শী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবহারাজীব ছিলেন। ব্যবসায়ে তাঁহার সত্যতা, কার্য্যদক্ষতা ও প্রচুর অভিজ্ঞতার জন্য তিনি কি গভর্ণমেণ্ট, কি জনসাধারণ, সকলেরই আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে কৃতিত্ব এবং ধনগৌরব অপেক্ষা স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, পরোপকারিতা, সৎকার্য্যে দান, আতিথেয়তা এবং বন্ধু-বৎসলতার জন্য তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার হিন্দু সমাজে চিরদিন পূজিত হইবে। তিনি অতিশয় মিতভাষী ছিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতি গুরু-গম্ভীর হইলেও যে ব্যক্তি একবার তাঁহার সান্নিধ্যে আসিত, তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার সৌজন্য ও তাঁহার সদালাপের

পরিচয় পাইয়া সে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একনিষ্ঠ সেবক ৺বলরাম বসুর সহিত আমি পরিচিত ছিলাম। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু আমার প্রতিবাসী বন্ধু ও আত্মীয়। হরিবল্লভ বাবু কলিকাতায় আসিলে তাঁহার বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেন ; এই স্থানেই তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। হরিবল্লভ বাবুর সহিত আমার দূর-সম্পর্কও ছিল। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার শ্যালক-কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব যে কেহ পুরী গমন করিত, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে প্রতিষ্ঠিত "শশিনিকেতনে" তাহাকে অবস্থান করিতেই হইত, কিছুতেই তিনি ইহার অন্যথা হইতে দিতেন না। আজ যদিও তিনি অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের সৌজন্যে পূর্ব্বব্যবস্থা এখনও অক্ষুন্ন থাকিয়া তাঁহার সহৃদয়তা ও আতিথেয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে। তাঁহার আত্মীয়স্বজন এবং পরমহংস দেবের শিষ্যগণ পুরী যাইলে আজিও এই বাড়ীতে অবস্থান করিয়া থাকেন।

শশিনিকেতন।

শশিনিকেতন বিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত সৌষ্ঠবসম্পন্ন দ্বিতল প্রাসাদ। প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু জমীদারবাটীর ন্যায় ইহার রন্ধনশালা, স্নানাগার, ভৃত্যদিগের আবাস-গৃহ, কাছারী-বাড়ী প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত ও ব্যবস্থিত এবং নানা ফল-পুষ্প শোভিত একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষবাটিকার দ্বারা এই উচ্চ সৌধ চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত। ঠিক বেলাভূমির উপর অবস্থিত না হইলেও সাগর এবং এই প্রাসাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে তখন কোন আবাসবাটী নির্ম্মিত হয় নাই। সুতরাং সাগরোর্ম্মি-চুম্বিত শীকরসিক্ত সুশীতল বায়ু-প্রবাহ এই অট্টালিকার সর্ব্বত্র অব্যাহতভাবে পরিবাহিত হইত। এই

প্রাসাদের দ্বিতল-সংলগ্ন অলিন্দ হইতে অনন্ত-বিস্তৃত মহোদধির তরঙ্গভঙ্গ দর্শন করিয়া মনঃপ্রাণ মুগ্ধ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইত। এই প্রাসাদ বহুকক্ষসমন্বিত। আমি যখন প্রথম পুরী গমন করিয়াছিলাম, তখন হরিবল্লভ বাবু ব্যতীত তাঁহার আত্মীয় কলিকাতার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবার তীর্থ-যাত্রা উপলক্ষে এই বাটীর মধ্যে সচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। আমিও কোন অসুবিধা ভোগ না করিয়া সপরিবারে এই বাটীতে এক মাসের অধিককাল সুখে বাস করিয়াছিলাম।

সমুদ্রের দৃশ্য।

পুরীর নিকট সমুদ্রের দৃশ্য মনোমধ্যে যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও ভয় উৎপাদন করে। আমি বোম্বাই, ওয়াল্‌টেয়ার্ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া সমুদ্র দর্শন করিয়াছি, কিন্তু পুরী-তটবর্ত্তী সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের যে গম্ভীর সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছি, তাহা অন্য কোথাও করি নাই। বহুদূর হইতে সমুদ্রের অশ্রান্ত গভীর গর্জ্জন গুরুগম্ভীর মেঘমন্দ্রের ন্যায় শুনিতে পাওয়া যায়। নিকটে আসিলে বহুসংখ্যক রেলগাড়ি একত্রে চলার শব্দের ন্যায় উহা প্রতীয়মান হয়। দিগন্তবিস্তৃত অতলস্পর্শ সুনীল জলরাশি এবং তদুত্থিত ফেনমণ্ডিত শুভ্রশিরঃ অগণিত তরঙ্গরাজি মনকে মুহূর্ত্তমধ্যে সান্ত হইতে অনন্তের রাজ্যে লইয়া যায় এবং ইহার অসীম শক্তির বিষয় চিন্তা করিয়া মন ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া মনে হয় যে, বিজ্ঞানবলে মানুষ যে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রাকৃতিক শক্তিকে কিয়ৎপরিমাণে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা মানবের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া রজত-শুভ্র সৈকতভূমি আলিঙ্গন পূর্ব্বক কত চিত্র-বিচিত্র শুক্তিসম্ভারে তাহার শীতল কোমল উন্নত বক্ষঃস্থল সুশোভিত করিয়া পুনরায় স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছে!

আমরা নগ্নপদে সৈকতভূমিতে ভ্রমণ করিতে যাইতাম ; সৈকতচুম্বী তরঙ্গরাজির শীতল সুখস্পর্শ আমাদের দেহ-মনকে এক অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি প্রদান করিত। রাত্রিকালে বেলাভূমির উপর পরিত্যক্ত কত শুক্তিখণ্ড গগনবিহারী তারকারাজির ন্যায় নীলাভ মৃদু স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ বিকিরণ করিত। সেগুলি দেখিতে ও আকারে বড় ঝিনুকের মত। উহার গহ্বরদেশ এক প্রকার শ্বেতবর্ণ কোমল পদার্থে আবৃত। এই শ্বেতাংশই অন্ধকারে আলোকময় প্রতীয়মান হইত। আমরা ইহা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইতাম এবং অন্ধকার গৃহে রাখিয়া উহার স্নিগ্ধ ভাস্বরতা উপভোগ করিতাম। ক্রমে উহা নিষ্প্রভ হইয়া যাইত এবং পরদিন রাত্রিতে উহা হইতে আর আলোকের স্ফুরণ হইত না। এই প্রাণী যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ উহা উজ্জ্বল দেখায়।

অন্ধকার রাত্রিতে দূরস্থিত তরঙ্গরাজির শীর্ষদেশ আলোকময় প্রতীয়মান হইত। আলোক-স্ফুরক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র সমুদ্র-বিহারী কীটাণুর সমাবেশে তরঙ্গশীর্ষ এইরূপ দীপ্তিমান হইয়া উঠে। দীপ্তশীর্ষ অসংখ্য তরঙ্গরাজি দূর হইতে দর্শন করিয়া মনে হইত, যেন জলাধিপতি বরুণরাজের দীপালোক-সমন্বিত উৎসবগৃহ সমুদ্রবক্ষে বিরাজ করিতেছে। কখন বা ভ্রম হইত, যেন অন্ধকার রাত্রিতে ভাগীরথিবক্ষ হইতে কলিকাতার আলোকময় রাজপথ ও প্রাসাদসমূহের চিত্র নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

আকাশের অবস্থানুসারে সমুদ্রের দৃশ্যের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইত। প্রাতঃকালে অসীম নীলাম্বুরাশি ভেদ করিয়া বৃহদায়তন লোহিতলোচন তরুণ অরুণের আবির্ভাব যে কি নয়নমনোরম, প্রীতিকর দৃশ্য, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! দ্বিপ্রহরের প্রখর-সূর্য্যকিরণ-সম্পৃক্ত সমুদ্রের দৃশ্য রৌদ্ররসের পরিচায়ক। আবার প্রদোষে স্বল্প-তারকা-

স্বর্গদ্বার ও মহোদধি।
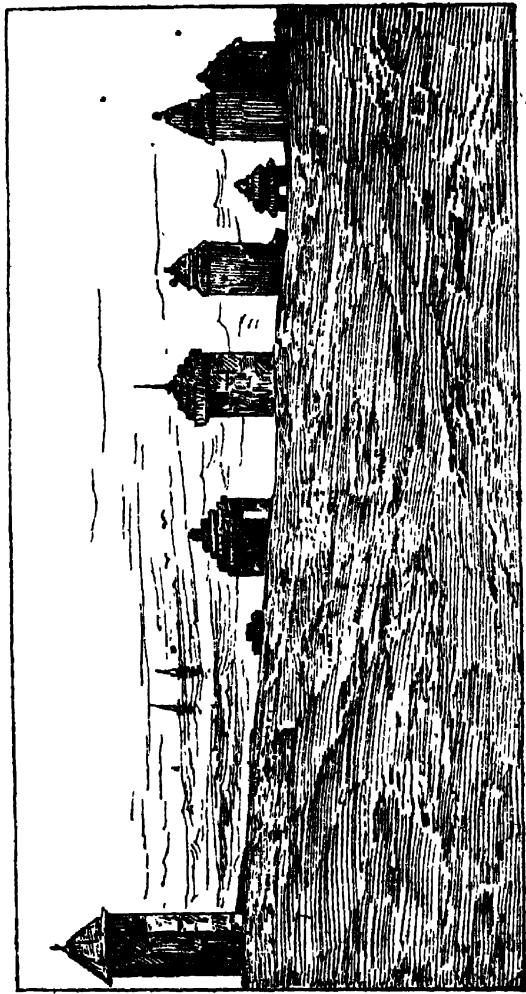
সঙ্কুল ধূসরবর্ণ গগনের ছায়া সাগরবক্ষে প্রতিফলিত হইলে, এক শান্ত, গম্ভীর, সুন্দর ছবি নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইত। পূর্ণিমা রজনীতে কৌমুদীপ্লাবিত রজতাস্তরণমণ্ডিত সমুদ্রবক্ষ কি এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিত! পুনশ্চ আকাশমণ্ডল যখন নিবিড় নীল নবীন নীরদজালে আবৃত হইত, যখন প্রবল বায়ুপ্রবাহে গভীর সমুদ্রবক্ষ বিক্ষোভিত হইতে থাকিত, যখন প্রভঞ্জন-সাহচর্য্যে গগনস্পর্শী চঞ্চল উর্ম্মিমালা দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া উদ্দাম তাণ্ডব-নৃত্য করিত, তখন সাগরের প্রলয়কালোচিত বিভীষণ সংহারমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া হৃদয় ভয়ে ও বিস্ময়ে অবসন্ন হইয়া পড়িত।

স্বর্গদ্বার ও মহোদধি।

পুরীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে সমুদ্র একটী। পুরীর শ্মশান, সমুদ্রতটবর্ত্তী "স্বর্গদ্বারের" নিকট। স্বর্গদ্বারের সান্নিধ্যে অবস্থিত সাগরাংশ "মহোদধি" তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে যাত্রিগণ পাণ্ডার সাহায্যে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সমুদ্রে স্নান করিয়া থাকে। মন্দির হইতে একটী প্রশস্ত পথ দিয়া স্বর্গদ্বারে যাইতে হয়। "বাট লোকনাথ" নামক শিবের মন্দির এবং সাধু হরিদাসের সমাধি এই পথের ধারে অবস্থিত। স্বর্গদ্বারে বালুকাস্তূপের উপর কয়েকটী ক্ষুদ্র সমাধি-গৃহ অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে শবদাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমুদ্র-স্নান।

তীর্থকার্য্য সম্পাদন ব্যতীত পুরীযাত্রিমাত্রেরই সমুদ্রস্নান একটী অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। নবাগত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, কি ইয়ুরোপীয় কি ভারতবাসী, সকলকেই অন্ততঃ দুই এক দিনের জন্যও প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যায় সমুদ্র-স্নানের সুখ ও দুঃখ উপভোগ করিতেই হইবে। সাগরে অবগাহনস্নান জীবনে অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে,

সুতরাং আমোদপ্রিয়তা এবং কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া (অথবা চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে) সকলেই এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পার্থিব অপর অভিজ্ঞতার ন্যায় ইহাতে যেমন সুখ আছে, তেমনই দুঃখও আছে। অনেকেরই দুই এক দিন স্নানের পর কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়া যায়; অতঃপর তাঁহারা সমুদ্রতীরে যাইয়া কেবল দর্শন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, জলে নামিতে ভরসা করেন না। বাস্তবিক পুরীর সমুদ্রে স্নান করা যেন ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা। অবিরাম তীরাভিমুখী তরঙ্গের মুহুর্মুহু ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ঢেউ খাওয়ার কৌশল না জানিলে বার বার আছাড় খাইতে হয় এবং তাহাতে অনেক সময়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হানি হইবার সম্ভাবনা। কাপড় আঁট করিয়া পরিধান না করিলে স্নানের সময় উহা দেহ হইতে বিচ্যুত হইবারই কথা। তীর হইতে একটু দূরে যাইয়া স্নান করিলে ঢেউয়ের সঙ্গে বেশী যুদ্ধ করিতে হয় না, কিন্তু ঢেউ সরিয়া যাইবার সময়ে পদতলস্থ বালুকারাশির সহিত স্নানার্থীকে অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের দিকে টানিয়া লইয়া যায়, এই জন্য অনেকে দূরে যাইয়া স্নান করিতে সাহস করে না। অনেকে মৎস্যজীবী নুলিয়াগণের সাহায্যে সমুদ্রস্নান সম্পন্ন করিয়া থাকেন; ইহাদিগকে দুই চারিটি পয়সা দিলেই ইহারা হাত ধরিয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসে। সমুদ্রস্নান বিশেষ তৃপ্তিকর হইলেও গৃহে ফিরিয়া আর একবার স্নান না করিলে তৃপ্তি হইত না, কারণ লোণাজল ও সূক্ষ্ম বালি দেহে সংলগ্ন থাকে বলিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয় এবং গা বড় চুলকায়। সমুদ্রে স্নান করিবার সময় চোখ ও মুখ বন্ধ করিয়া রাখা উচিত, নচেৎ লবণাক্ত জল চোখ ও মুখে প্রবেশ করিলে বিশেষ কষ্ট ও অসুবিধা হয়।

এই ভীষণ-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রে ধীবরেরা নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে তাহাদের কাষ্ঠনির্ম্মিত ডোঙ্গায় চড়িয়া বহুদূরে মাছ ধরিতে গমন করে। এ অঞ্চলের ধীবরগণ "নুলিয়া" নামে প্রসিদ্ধ। তাহারা মাদ্রাজের আদিম অনার্য্য অধিবাসী এবং তাহাদিগের ভাষা তেলেগু। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ, উন্নতদেহ, বলিষ্ঠ ও অতিশয় শ্রমসহ। তাহাদের দেহের মাংসপেশীসমূহ অতীব দৃঢ় ও প্রকট। তাহারা কৌপীনধারী, অন্যথা সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কেবল মাথায় কাণ ঢাকা, টোপরের মত একটা পাতার টুপী পরে। সমুদ্রের তীরে বালুভূমির উপর তাহাদের পত্রাচ্ছাদিত, প্রায় চতুর্দ্দিকে বদ্ধ, বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠসমন্বিত লম্বমান্ দোচালা আবাস-গৃহগুলি সমান্তরাল ভাবে সন্নিবেশিত থাকিতে দেখা যায়। দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ কুটীরগুলির মধ্যস্থল চলিবার পথ। তাহাদের দেবতা—সমুদ্র, ভূত, পিশাচ ইত্যাদি। প্রত্যেক পল্লীর মধ্যে দুই একটী ক্ষুদ্র দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং দেবতার নিকট তাহারা ছাগ, মোরগ প্রভৃতি প্রাণী বলি দিয়া থাকে। তাহাদের মাছ ধরিবার নৌকা, খোন্দলযুক্ত পৃথক তিন খণ্ড লম্বমান কাষ্ঠ দড়ি দ্বারা একত্রে বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সমুদ্রে ভাসে, জলপূর্ণ হইলেও কখন ডোবে না। অনেকস্থলে এইরূপ একখণ্ড কাষ্ঠই নৌকার কাজ করে। যে সকল নৌকা জাহাজে মাল বা যাত্রী তুলিয়া দেয়, সেগুলি বৃহদাকারের এবং একপ্রকার গাছের ছাল দ্বারা তৈয়ারী হয়। তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহাদের ক্ষুদ্র নৌকা, অনেক সময়ে মনে হয় যেন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার উহাকে আরোহিসহ তরঙ্গের শীর্ষদেশে ভাসিয়া উঠিতে দেখা যায়। খুব বড় একখানি জাল লইয়া তিন চারি খানা নৌকা মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত একত্রে সমুদ্রে ভাসমান হয় এবং

মুলিয়ারা এইরূপে বহুদূরে যাইয়া জাল ফেলিয়া বিস্তর সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ করে। যাঁহারা পুরী গমন করেন, আমিষভোজী হইলে সুস্বাদু সামুদ্রিক মৎস্যভক্ষণের লোভ তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পুরীর সমুদ্রে পায়রাচাঁদা, পাব্‌দা, ভেটকি, ইলিশ, গল্‌দাচিংড়ি প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সুদীর্ঘ চাবুকের ন্যায় পুচ্ছযুক্ত শঙ্করমাছ, হাঙ্গর প্রভৃতি জালে ধরা পড়ে। সামুদ্রিক মৎস্য কিছু বেশী তৈলাক্ত; বিবেচনা পূর্ব্বক ভক্ষণ না করিলে উদরের পীড়ায় কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কেহ কেহ সাহস করিয়া ধীবরগণের সহিত তাহাদের নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিয়া থাকেন। আমার সঙ্গে নয় বৎসর বয়স্কা আমার এক কন্যা ছিল। সমুদ্রে যাইতে আমার সাহসে কুলায় নাই, কিন্তু আমার কন্যা ধীবরদিগের সহিত তাহাদের ডোঙ্গায় সমুদ্রবক্ষে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিল্।

আমি যখন প্রথম পুরী গিয়াছিলাম, তখন সমুদ্রের তীরে ভারতবাসীদিগের আবাসগৃহ অধিক ছিল না। যে উচ্চ পতাকা-স্তম্ভ (Flag-staff) সমুদ্র-তীরে প্রোথিত আছে, তাহার এক দিকে কমিশনার্, ম্যাজিষ্ট্রেট্, সিভিল্ সার্জ্জন্ প্রভৃতি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের অনেকগুলি বাংলা ও পাকা গৃহ অবস্থিত ছিল। সেখানে বেসরকারী কোন ভারতবাসীকে গৃহনির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া হইত না। পতাকা-স্তম্ভের অপরদিকে তখন দুই চারি খানি মাত্র ভারতবাসীদিগের পাকা বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখন সমুদ্রতীরে বিস্তর সৌষ্ঠবসম্পন্ন অট্টালিকা ও স্বাস্থ্যনিবাস নির্ম্মিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অনেকেই এখন পুরী যাইয়া সমুদ্রতটস্থিত এই সকল প্রাসাদে সুখে অবস্থান করেন। ইয়ুরোপীয়দিগের বাসের সুবিধার জন্য সমুদ্রতটে কয়েকটী হোটেল স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের অবস্থানের

নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, দেখিয়া আসিয়াছি। সমুদ্রতীরে একটী আলোক স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গের জন্য পুরীর তট-ভূমিতে জাহাজ লাগাইতে পারা যায় না। তট হইতে বহুদূরে জাহাজ অবস্থিতি করে এবং নৌকাযোগে মাল বা যাত্রী বহন করিয়া জাহাজে উঠাইয়া দিতে হয়।

সমুদ্রের জল বিষম লবণাক্ত হইলেও বালুকাময় তটদেশে যে সকল কূপ খনন করা হয়, তাহাদিগের জল সুমিষ্ট ও সুপেয়। সহরের মধ্যে যে সকল কূপ আছে, তাহাদের জল মোটেই বিশুদ্ধ নহে। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কূপের জল পানের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তবে পুরীর ন্যায় যাত্রী-বহুল তীর্থস্থানে পানীয় জল না ফুটাইয়া পান করা উচিত নহে। জলের দোষে পুরীতে উদরাময়, রক্তামাশয়, কলেরা প্রভৃতি উৎকট রোগে অনেকে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

আমাদিগের পাণ্ডা ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে পুরুষোত্তম তীর্থের পৌরাণিক কাহিনী যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

অবন্তীনগরের অধিপতি ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট দেবর্ষি নারদ প্রথমতঃ পুরীর স্থান-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া ভূপতি

পুরীর পৌরাণিক কাহিনী।

তাঁহার কুলপুরোহিতের সহোদর বিদ্যাপতিকে এই পবিত্র স্থান দর্শনের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি এই স্থানে বসু নামক এক শবরের সহিত মিলিত হয়েন এবং তৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া "নীলাচল" নামক এক অনতি-উচ্চ শৈলখণ্ড দর্শন করেন। নীলাচলের উপর "নীলমাধব", "বিমলা" "নৃসিংহ" প্রভৃতি অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া ঐ স্থানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে এবং অবন্তীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাজার নিকট সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করেন। রাজা সৈন্যসামন্ত পাত্রমিত্রাদি সমভিব্যাহারে পুরীতে আগমন পূর্ব্বক বর্ত্তমান ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর যে স্থানে অবস্থিত, উহার সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করেন এবং ঐ স্থানে এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া নিজ নামে ঐ সরোবরের নামকরণ করিয়াছিলেন। ঐ সরোবর আজিও ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত। প্রবাদ এই যে রাজা ঐ স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং উক্ত যজ্ঞে যে সকল গাভী দান করিয়াছিলেন, তাহাদিগের খুরের আঘাতে যে খাত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাই কালে এই সরোবরে পরিণত হইয়াছে।

বসু সবরের পুত্র দ্বৈতাপতি। তাঁহারই বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে পাণ্ডারূপে জগন্নাথ দেবের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর পুরীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ। তীর্থ-যাত্রীর পক্ষে ইহা অবশ্য দর্শনীয়। মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সরোবরে স্নান করিতে হয়। এই পুষ্করিণীতে অনেক কচ্ছপ বাস করে। পাণ্ডারা "কাড়ে কাড়ে" বলিয়া আহ্বান করিলে তাহারা স্নানের ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যাত্রীদিগের প্রদত্ত খাদ্য-সামগ্রী আগ্রহের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর জল মলিন ও সবুজবর্ণের। ইহার চতুর্দ্দিকের পাড় পাকা করিয়া বাঁধান।

পঞ্চতীর্থ।

"মার্কণ্ডেয় বটং কৃষ্ণো রোহিণেয়ো মহোদধিঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থাবিধিঃ স্মৃতং॥'

ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্যতীত আর চারিটী তীর্থ পুরী-যাত্রীকে দর্শন করিতে হয়। ইহাদিগের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে 'মহোদধির' উল্লেখ করা হইয়াছে। "মার্কণ্ডেয়" পুষ্করিণীতে স্নান করিতে হয় এবং "রোহিণীকুণ্ডের" জল লইয়া মস্তকে ছিটা দিতে হয়। বটকৃষ্ণ পঞ্চম তীর্থ। প্রত্যেক তীর্থ-যাত্রীকে পুরীতে অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস করিয়া এই পঞ্চতীর্থ দর্শন করিতে হয়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন যে, সকল দেবতাই তথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কেবল "নীলমাধব" অদৃশ্য হইয়াছেন। এই ঘটনায় তাঁহার অতিশয় নৈরাশ্য উপস্থিত হইল। রাত্রিতে স্বপ্ন দ্বারা তিনি 'মাধবের' একটী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবার এবং নীলাচলের উপর "মাধব" যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তথায় উহা স্থাপন করিবার নিমিত্ত আদিষ্ট

অসম্পূর্ণ বিগ্রহ।

হইলেন। এই বিগ্রহের উপাদান ও নির্ম্মাণ সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। রাজার স্বপ্ন হইয়াছিল যে, কতকগুলি কাষ্ঠখণ্ড তিনি সমুদ্রে ভাসমান দেখিতে পাইবেন এবং উহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া 'মাধবের' বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া এই মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবার আদেশ করেন। দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বলেন যে, তিনি রাজাদেশে রুদ্ধগৃহে অন্যের অগোচরে সাত দিনের মধ্যে বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া দিবেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি কোন কারণে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। রাজা এই নিয়ম পালনে প্রতিশ্রুত হইলে বিশ্বকর্ম্মা নির্জ্জনে "মাধবের" প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পঞ্চদিবস অতীত না হইতেই রাজা (কাহারও মতে তাঁহার মহিষী) কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ সত্ত্বেও দ্বার ভগ্ন করিয়া উক্ত গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। তখনও বিগ্রহ সম্পূর্ণ হয় নাই। দেব-শিল্পী রাজার ঈদৃশ অন্যায় ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই সে স্থান পরিত্যাগ করেন। এই কারণে আজ পর্য্যন্ত জগন্নাথের মূর্ত্তি হস্তপদবিহীন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নিজ কার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করেন। তথায় তিনি এত অধিককাল বাস করিয়াছিলেন যে, যখন তিনি পৃথিবীতে পুনরাগমন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার রাজ্য, আত্মীয় স্বজন, প্রজাবর্গ সকলই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে পুরীতে গালমাধব নামক এক জন রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন "মাধবের" অসম্পূর্ণ দারুবিগ্রহ তখনও নীলাচলে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তিনি গালমাধবের অনুমতি লইয়া শাস্ত্রবিহিত হোম, যাগ প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান দ্বারা মহাসমারোহে উক্ত বিগ্রহ নীলাচলের উপর

প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বিগ্রহের উপরে বহুকালে পরে বর্ত্তমান পুরীর মন্দির নির্ম্মিত হয়। ঐ বিগ্রহই বর্ত্তমান্ "জগন্নাথ"। কিন্তু তাঁহার আদি-দারুমূর্ত্তি এখন আর নাই। মন্দিরের নিয়মানুসারে প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে জগন্নাথের "দেহ-পরিবর্ত্তন" হইয়া থাকে এবং কাষ্ঠনির্ম্মিত নূতন মূর্ত্তিতে তাঁহার পুনরধিষ্ঠান হয়। মন্দির সংলগ্ন "বৈকুণ্ঠ" নামক স্থানে প্রতি যুগান্তে তাঁহার নব কলেবর নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

উড়িষ্যার কেশরীবংশীয় সুবিখ্যাত নৃপতি যযাতি কেশরীর রাজত্বকালে পুরীর মন্দিরের প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরীর ইতিহাস।

যাজপুর যযাতি কেশরীর রাজধানী ছিল। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করেন। তিনিই প্রথমে জগন্নাথদেবের একটী মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কালে ঐ মন্দির জীর্ণ ও অব্যবহার্য্য হইলে গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেব নামক নৃপতি ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন*। নাটমন্দির প্রভৃতি অপর মন্দিরগুলি বহুকাল পরে নির্ম্মিত লইয়াছিল। ইহাদিগের উচ্চতা আদি-মন্দির হইতে অনেক কম।

উড়িষ্যায় মুসলমানদিগের ধর্ম্ম বিদ্বেষের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, বোধ হয়, হিন্দুর অন্য কোন তীর্থস্থানে সেরূপ দেখা যায় না। ১৫৬৮

---

(১) শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্রনায়কে।
প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা॥

মন্দিরস্থ লৌহফলক।

(২) অঙ্কক্ষৌণি শশাঙ্কেন্দু সম্মিতে শকবৎসরে।
অনঙ্গ ভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীদান কৃতঃ॥

গঙ্গবংশানুচরিতম্।

খৃষ্টাব্দে হিন্দুরাজা মুকুন্দদেবকে জয় করিয়া পাঠানগণ প্রথমতঃ উড়িষ্যায় আধিপত্য স্থাপন করেন। কালাপাহাড় ও অন্যান্য দেবদ্বেষী মুসলমানগণ উড়িষ্যার বহু দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরের ধ্বংসসাধন এবং অধিকাংশ মূর্ত্তিকে নাসিকা, হস্ত বা পদবিহীন করেন। ভুবনেশ্বর, পুরী এবং অন্যান্য তীর্থস্থানে এই ধর্ম্মান্ধতা ও অত্যাচারের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। জনশ্রুতি এই যে, কালাপাহাড় জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি মন্দির হইতে বহির্গত করিয়া অগ্নিসংযোগে দাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একজন ভক্ত বহুকষ্টে চিতা হইতে দেবমূর্ত্তির উদ্ধার সাধন করিয়া পলায়ন করেন। আকবরেব রাজত্বসময়ে মানসিংহ পাঠানগণকে জয় করিয়া উড়িষ্যাকে মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করেন। তদবধি উড়িষ্যা বাঙ্গালার সুবেদারের শাসনাধীন থাকে। নবাব আলিবর্দ্দির শাসনকালে বাঙ্গালা দেশে বর্গীর উপদ্রব উপস্থিত হয়। নবাব বহু চেষ্টা করিয়াও বাঙ্গালার প্রজাসমূহকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন নাই। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। ইহার ফলে উড়িষ্যা মহারাষ্ট্ররাজ্যভুক্ত এবং সুবর্ণরেখা নদী বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ সুবর্ণরেখা পার হইয়া বাঙ্গালা দেশে আর উৎপাত করিবেন না, এইরূপ প্রতিশ্রুত হওয়াতে নবাব তাঁহাদিগকে বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা "চৌথ" স্বরূপ প্রদান করিবেন, সন্ধিসূত্রে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন এবং এই অর্থ সংগ্রহের জন্য বাঙ্গালার জমীদারদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া "চৌথ মারহাট্টা" নামক এক নূতন কর স্থাপন করিলেন।

ইংরাজেরা ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় অধিকার স্থাপন করেন। জগন্নাথের মন্দিরের ব্যয়ের জন্য মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তৃগণ রাজকোষ

হইতে বৎসরে ৩০ হইতে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করিতেন। তাঁহারা যাত্রীদিগের উপর মাশুল বসাইয়া এই টাকা সংগ্রহ করিতেন। তখন রেলপথ হয় নাই, যাত্রিগণ হাঁটাপথে ১৮টি খিলান-বিশিষ্ট "আঠারনালা" নামক সেতু পার হইয়া পুরীতে গমন করিত। যাত্রিদিগের নিকট হইতে তাহাদের সামাজিক অবস্থা অনুসারে মাশুলের পরিমাণ নির্দ্ধারিত এবং সেতু পার হইবার সময়ে উহা আদায় করা হইত। এই সেতু পুরীর উত্তরাংশে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থানেই প্রথমে শ্রীমন্দিরের চূড়া যাত্রিগণের নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। প্রবাদ আছে যে, এক একটি নরবলি দিয়া এই সেতুর এক একটি খিলান প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সেতুর নিকট "শ্বেতগঙ্গা" নামক একটী পুষ্করিণী এবং একটি বৃহৎ ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রিগণ পুরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পুরীর রাস্তায় চলিবার সময়ে "মহাপ্রসাদ" পদদলিত করিবার জন্য যে পাপসঞ্চয় করিয়া থাকে, এই পুষ্করিণীতে পদপ্রক্ষালন করিয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভ করে। সাধু-সন্ন্যাসীর দল এবং মাশুল প্রদানে অসমর্থ সামান্য অবস্থার যাত্রিগণকে পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মশালায় অবস্থিতি করিতে হইত এবং সপ্তাহে একদিন বিনা মাশুলে তাহারা পুরী প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইত।

দেব-সেবার ব্যবস্থা।

১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজরাজ দেবসেবার ব্যবস্থা সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। খুরদা নামক স্থানে উড়িষ্যার প্রাচীন রাজবংশ তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমান খুরদা জংসন্ ষ্টেশন্ এই স্থানে অবস্থিত। উক্ত রাজা খুরদা বা পুরীর রাজা নামে অভিহিত হইতেন এবং খুরদা নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহার হস্তে জগন্নাথের

মন্দির পরিচালনের ভার অর্পণ করেন এবং মন্দিরের খরচের জন্য তাঁহাকে বৎসরে ৬০০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। এই ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ইংরাজরাজ যাত্রীদিগের উপর তাহাদিগের অবস্থানুযায়ী একটি মাশুল নূতন করিয়া স্থাপন করেন। অবস্থাপন্ন প্রত্যেক যাত্রীকে এই নূতন ব্যবস্থায় ছয় হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত কর দিতে হইত। সামান্য অবস্থার যাত্রীদিগের নিকট হইতে ২৲ টাকা মাত্র আদায় করা হইত। কেবল উড়িষ্যার প্রকৃত অধিবাসী, ব্যবসাদার, মন্দিরের কার্য্যে নিযুক্ত জলবাহকগণ ও সাধু-সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে এই মাশুল দিতে হইত না। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের সময়ে যাত্রিগণের নিকট যে পরিমাণ মাশুল আদায় করা হইত, বৃটিশ্ গভর্ণমেণ্ট তাহার পনর ভাগের এক ভাগ মাত্র আদায় করিতেন।

ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট্, পৌত্তলিক হিন্দুর দেবপূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থের ব্যবস্থা করাতে খৃষ্টিয় মিশনারিগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়া এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্ট্ যাত্রীর উপর মাশুল একেবারে উঠাইয়া দেন এবং মন্দিরের ব্যয়ের জন্য বাৎসরিক ৫৬০০০৲ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া দেব-সেবার সমস্ত কার্য্যের ভার খুর্দার রাজার হস্তে ন্যস্ত করেন এবং মন্দিরের সহিত সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তদবধি খুর্দা বা পুরীর রাজাই জগন্নাথের প্রধান সেবক। তাঁহার রাজবাটী মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থিত। আমরা যখন প্রথমে পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন শুনিয়াছিলাম যে, রাজার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর যাত্রীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় বর্ত্তমান সময়ে মন্দিরের আয় সবিশেষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও মন্দিরের কার্য্যের ব্যবস্থা পূর্ব্বের ন্যায় সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইতেছিল না।

পাণ্ডাদিগের দ্বারা অর্থের বিস্তর অপব্যয় হইত। যাত্রীদিগের প্রদত্ত বহুমূল্য উপঢৌকনাদি অনেক সময়ে দেবসেবার জন্য ব্যবহৃত না হইয়া পাণ্ডাদিগের গৃহে স্থানলাভ করিত। রাজা মন্দিরের কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাইস্ নামক একজন পেন্সন্‌প্রাপ্ত ইংরাজ সিভিলিয়ানকে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় যাত্রীদিগের প্রদত্ত প্রণামী ও দক্ষিণা হইতেই দেব-সেবার সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত; এমন কি, দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ের উপর মোটেই হস্তক্ষেপ করিতে হইত না। পাণ্ডাদিগের অসদুপার্জ্জনের পথে এইরূপ অন্তরায় হওয়ায় তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে কুপরামর্শ দিয়া মিষ্টার্ প্রাইস্‌কে কর্ম্মচ্যুত করায়। এইরূপে পাণ্ডাগণ পুনরায় যাত্রীদিগের সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর ব্যবসা করিবার অবসর পাইল এবং পূর্ব্বে মন্দিরের কার্য্যে যেরূপ বিশৃঙ্খলতা ও অপব্যয় বিদ্যমান ছিল, তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইল। বর্ত্তমান সময়ে রায় বাহাদুর সোখীচাঁদ নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারী অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেছেন। শুনিতে পাই যে তাঁহার সুব্যবস্থায় মন্দিরের কার্য্য সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। রায় বাহাদুর সোখীচাঁদ একজন হৃদয়বান্ ব্যক্তি; পুরীর দুর্ভিক্ষের সময় বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়া আর্ত্ত-ব্যক্তিগণের উদরান্নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পুরীতে একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন।

দেব-সম্পত্তির অপব্যবহার।

"হিন্দুর সকল তীর্থস্থানেই দেব-সম্পত্তির যথেষ্ট অসদ্ব্যবহার ও অপব্যয় হইয়া থাকে। পাছে ধর্ম্মকর্ম্মে হস্ত-ক্ষেপণ করা হয়, এই আশঙ্কায় আইন প্রণয়ন করিয়া ইহার সুব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্ট সাহসী হয়েন না। মান্দ্রাজবাসী স্বর্গগত আনন্দ চার্লু মহাশয় এই অপব্যয় নিবারণের

জন্য আইন প্রবর্ত্তনের বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুগণই তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করায় তিনি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দেবস্থানের অধিকারী অনেক মোহান্তের চরিত্র যেরূপ জঘন্য ও কলুষিত এবং দেবোত্তর সম্পত্তির আয় আপনাদিগের ভোগলালসা-পরিতৃপ্তির জন্য যেরূপ অন্যায় ভাবে তাঁহারা অপব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাতে ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেরই এই অপব্যয়ের নিবারণের ব্যবস্থা করা উচিত। দেব-সম্পত্তি সমাজের বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের (Trustees) হস্তে ন্যস্ত থাকা উচিত এবং দেবসেবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা দেবস্থানাধিকারী মোহান্তের হস্তে প্রদান করিয়া তাহার উপযুক্ত ব্যবহার হইতেছে কি না, তাহার তত্ত্বাবধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সরল ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রিগণের বহুক্লেশোপার্জ্জিত অর্থের সাহায্যে আমাদিগের তীর্থস্থান সমূহে প্রত্যহ যে কত অত্যাচার ও ব্যভিচার অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। জানিয়া শুনিয়া যদি হিন্দু-সমাজ এই অত্যাচার নিবারণের যথোচিত ব্যবস্থা না করেন, তাহা হইলে যাঁহারা তীর্থে গমন করিয়া দেবসেবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে গৌণভাবে মোহান্তের পাপ কার্য্যের সাহায্য করেন এবং তাহার ফল ভোগ করিতে অবশ্য বাধ্য, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। উড়িষ্যায় জগন্নাথের মন্দির ব্যতীত বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল মঠের ব্যয়ের জন্য বিস্তর দেবোত্তর-সম্পত্তি মঠের মোহান্তগণের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। দেব-পূজা, শিক্ষা, শাস্ত্রচর্চ্চা এবং সাধু-সন্ন্যাসী ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মপ্রাণ, বিত্তসম্পন্ন অনেকানেক হিন্দু নরনারী কর্ত্তৃক এই বিপুল সম্পত্তি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। শুনিয়াছি পুরীর মঠ সকলের বাৎসরিক আয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। এখন ধর্ম্মপ্রাণ দাতৃগণের সেই

প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। সমস্ত সম্পত্তি মঠের অধিকারীর হস্তগত হইয়া, সম্পত্তির বিপুল আয় তাহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যাবাসিগণ এ বিষয়ে একবার আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটী কমিটী গঠন করিয়া যে উপায়ে ইহার সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহার আলোচনা করিয়া প্রতীকারার্থ একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। যতদূর জানা আছে, কমিটীর মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। এ বিষয়ের সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া উপযুক্ত আইনের সাহায্যে যাহাতে এই দেবোদ্দিষ্ট অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তাহার ব্যবস্থা করা প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য।

যযাতিকেশরী যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং অনঙ্গ ভীমদেব যাহার পূর্ণ সংস্কারসাধন করেন, তাহাই আদি বা মূল-মন্দির। ইহাই "শ্রীমন্দির" নামে পরিচিত। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে গঙ্গাবংশীয় নৃপতি গঙ্গেশ্বর বা চোড়গঙ্গা সর্ব্বপ্রথম ইহার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার রাজত্বকাল খ্রীষ্টাব্দ ১০৭৫ হইতে ১১৪২। শ্রীমন্দিরের মধ্যে রত্ন-বেদী বা "মণি-কৌটা" প্রতিষ্ঠিত এবং তদুপরি জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার দারুময়, বিবিধবর্ণে রঞ্জিত, সুবৃহৎ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। জগন্নাথের এক পার্শ্বে গদার আকারে প্রস্তরনির্ম্মিত সুদর্শন চক্র অবস্থিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বর্ণময়ী লক্ষ্মীমূর্ত্তি, শুভ্রা সরস্বতী এবং নীলমাধবের প্রতিমূর্ত্তি রত্নবেদীর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

জগন্নাথের মন্দির।

শ্রীমন্দিরের উচ্চতা প্রায় ১২৫ হাত। উহা দৈর্ঘ্যে ১০০ এবং প্রস্থে প্রায় ৪৫ হাত। মন্দিরের চূড়ায় চক্র ও ধ্বজা শোভা পাইতেছে। বহুদূর হইতে, এমন কি, ৫।৬ মাইল ব্যবধানে শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং দূর হইতে চূড়া দর্শন করিয়া যাত্রিগণ ভক্তি ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়ে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দূর হইতে শ্রীমন্দিরের চক্রধ্বজশোভিত চূড়াদর্শন করিয়া প্রেম ও ভক্তিতে কিরূপ বিহ্বল হইয়াছিলেন, তাহা গোবিন্দদাস তাঁহার কড়্‌চায় এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

*   *   *   *

"ধ্বজ দেখি মহাপ্রভু পড়িল ধরায়॥
এমন অশ্রুর বেগ দেখি নাই কভু।
পঙ্কিল করিল ধরা অশ্রুস্রোতে প্রভু॥
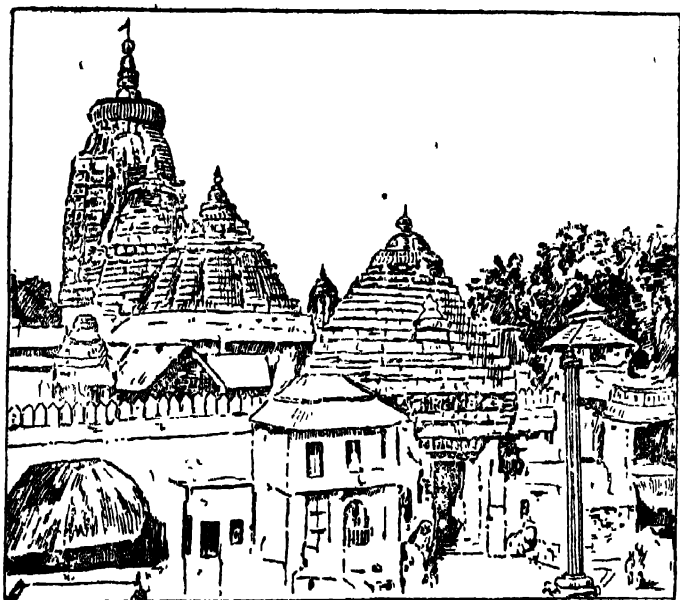
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির।

হা হা প্রভু জগন্নাথ বলিয়া শ্রীহরি।
ভাসাইল ভূমিতল অশ্রুপাত করি॥
আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে উভরায় কাঁদে।
সম্মুখে যাহারে দেখে বাহুপাশে ছাঁদে॥”

অনেকানেক ভক্ত যাত্রী অর্থব্যয় করিয়া চূড়ায় ধ্বজা লাগাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন। পাঁচসিকা বা পাঁচ টাকা দিলেই পাণ্ডাগণ ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারের পতাকা চূড়ায় লাগাইবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ঠাকুর দেখিবার পরে যাত্রিগণ মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

সিংহদ্বার।

পুরীর মন্দির প্রায় ১৮ হাত উচ্চ প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটী প্রাকারে বেষ্টিত। বাহিরের প্রাচীরে সিংহদ্বার, হস্তিদ্বার, অশ্বদ্বার এবং খাঞ্জাদ্বার নামধেয় চারিটি দ্বার আছে, ইহারা পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত। পূর্ব্বমুখী দ্বারই প্রধান প্রবেশপথ, ইহা “সিংহদ্বার” নামে পরিচিত। ইহা “বড়দাণ্ড” নামক পুরীর প্রধান প্রশস্ত রাজপথের উপর স্থাপিত। ইহার দুই পার্শ্বে প্রস্তরনির্ম্মিত সুবৃহৎ অদ্ভুতাকৃতি দুইটি সিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সিংহদ্বারটি চূড়াসমন্বিত।

অরুণস্তম্ভ।

সিংহদ্বারের সম্মুখে রাজপথের উপর অষ্টকোণবিশিষ্ট “অরুণস্তম্ভ” নামক প্রায় ২৩ হাত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তরময় ষোড়শপলসমন্বিত একটি উচ্চ স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্তম্ভের পাদপীঠও প্রস্তর নির্ম্মিত এবং উহার গাত্রে বিবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। অরুণস্তম্ভের উচ্চতা রত্ন-বেদীর সহিত সমান। এই স্তম্ভ দ্বারা বাহির হইতে জগন্নাথের সিংহাসনের উচ্চতা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার উপরে উপবেশনাবস্থায় একটী মর্কট মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রাধিবাসীগণ

কর্ত্তৃক পুরী হইতে প্রায় নয় ক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত "কোনার্ক" নামক স্থান হইতে এই প্রস্তরস্তম্ভ স্থানান্তরিত হইয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

সিংহদ্বারের নিকট পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের ভিতরে চর্ম্মনির্ম্মিত কোন পদার্থ লইয়া যাইবার আদেশ নাই, এমন কি, চামড়ার মণিব্যাগ্ (Money-bag) পর্য্যন্ত বাহিরে রাখিয়া যাইতে হয়, নহিলে পাণ্ডাগণ বিষম গোলযোগ উপস্থিত করে এবং কিছু দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি পাওয়া যায় না। আমি একদিন ভ্রমক্রমে চামড়ার মনিব্যাগ্ ভিতরে লইয়া গিয়াছিলাম। দেব-দর্শনের প্রণামী দিবার সময়ে উহা বাহির করাতে পাণ্ডারা সেদিনকার ভোগ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া গণ্ডগোল করিতে আরম্ভ করিল এবং ভোগের মূল্যস্বরূপ ৩০০৲ টাকা আমার নিকট দাবী করিল। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর অষ্টগণ্ডা পয়সায় ক্ষতিপূরণ রফা হইল এবং আমার নিকট হইতে ঐ পরিমাণ দণ্ড আদায় করিয়া পাঁচ জনে বণ্টন করিয়া লইল।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে দক্ষিণে "পতিতপাবন" মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। যাহাদিগের মন্দিরপ্রবেশ নিষেধ, তাহারা রাজপথ হইতে এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জগন্নাথ দর্শনের ফল লাভ করে। প্রবাদ এই যে চৈতন্যদেব এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। বামদিকে কাশীর বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার বাহন ষণ্ডের প্রস্তরময় মূর্ত্তি এবং শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত।

সিংহদ্বার পার হইয়া ২২টি সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতীয় প্রাচীর সংলগ্ন দ্বারের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই দ্বার পার হইলে শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করা যায়। ভিতরের অঙ্গন দৈর্ঘ্যে ২৮০ হাত এবং প্রস্থে ২১০ হাত।

সোপানাবলীর দুই পার্শ্বে জগন্নাথদেবের প্রসাদ (নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য) বিক্রীত হইয়া থাকে। যাত্রিগণ ইহা ক্রয় করিয়া দেশ-বিদেশে লইয়া যায়।

রন্ধনশালা।

সোপান বাহিয়া উপরে উঠিলে বামদিক্ দিয়া জগন্নাথের রান্নাবাড়ী যাইবার পথ। রান্নাবাড়ীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তবে আশ-পাশ হইতে ভিতরের ব্যাপার কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে উনানের সংখ্যা ও রন্ধনের ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শত শত উনান জ্বলিতেছে, একটির উপর আর একটি করিয়া বহুসংখ্যক মৃণ্ময় হাঁড়ি উপর্য্যুপরি চাপান হইয়াছে, কোনটিতে ভাত, কোনটিতে দাল, কোনটিতে তরকারী প্রস্তুত হইতেছে, উষ্ণ জলের ভাপরায় অধিকাংশ দ্রব্যাদি সিদ্ধ হইতেছে। পাচক ব্রাহ্মণের সংখ্যা দুই শতের কম নহে এবং তদুপযুক্তসংখ্যক "যোগাড়ে"রা কাজ করিয়া নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইতেছে না। কাঠের জ্বালে জগন্নাথের ভোগ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এত লোক একত্র এক স্থানে কার্য্য করিলেও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয় না। পুরী সহরের অধিকাংশ অধিবাসী এবং যাত্রিগণ রন্ধনের সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, জগন্নাথের ভোগ খাইয়াই জীবনধারণ করে। সুতরাং জগন্নাথের মন্দিরে প্রত্যহ যে কত সহস্র লোকের অন্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

আনন্দ-বাজার।

সিঁড়ি উঠিয়া দক্ষিণদিকে "আনন্দবাজার"। এই স্থানে সমস্ত দিন জগন্নাথদেবের অন্নপ্রসাদ (রান্না ভাত, দাল ইত্যাদি) বিক্রয় করা হয়। বিস্তর লোক রন্ধনের লেঠা উঠাইয়া এই প্রসাদ ক্রয় ভক্ষণ করিয়া থাকে। ক্রয়

করিবার সময়ে সকলেই ইহা মুখে দিয়া উচ্ছিষ্ট করিতেছে, কিন্তু কেহ তাহাতে দোষ ধরে না। পুরীতে অন্যান্য হিন্দুতীর্থের ন্যায় জাতি বা সকড়ির বিচার নাই; এ স্থানে যে কেহ অপরের স্পৃষ্ট বা উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। এই আচারটী বৌদ্ধভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়।

অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরের দরজা অতিক্রম করিয়া একটী সুবৃহৎ চত্বরে প্রবেশ করা যায়। ইহার মধ্যস্থলে শ্রীমন্দির অবস্থিত এবং চতুঃপার্শ্বে বিমলা, রাধাকৃষ্ণ, গণেশ, গোপীনাথ, মহাবীর, ধর্ম্মরাজ, ভুবনেশ্বর, নীলমাধব, সরস্বতী, মার্কণ্ডেশ্বর, পাতালেশ্বর, নৃসিংহ, সত্যভামা, সর্ব্বমঙ্গলা, ইন্দ্রানী, মহালক্ষ্মী প্রভৃতি নানা দেবদেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে (৮৬ পৃষ্ঠায় মন্দির প্রাঙ্গনের নক্সা দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্দিরের বাহিরের দিকের দেওয়ালে বিস্তর মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে অশ্লীলতাব্যঞ্জক চিত্রের অভাব নাই।

মূল-মন্দিরটির ("বিমান") সম্মুখে "জগমোহন", তৎপরে "নাট-মন্দির" এবং সর্ব্বশেষে "ভোগমণ্ডপ।" এই চারিটী একত্রে জগন্নাথের মন্দির নামে পরিচিত।

দ্বিতীয় দ্বারের সম্মুখে ভোগমণ্ডপের যে দরজা অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। সুতরাং শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে দক্ষিণ বা বামদিক্ দিয়া ঘুরিয়া নাটমন্দিরের পার্শ্বস্থিত দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। নাটমন্দিরের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী স্তম্ভ "রত্ন-বেদী"কে সম্মুখে করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে। ইহার উপরে গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই জন্য ইহার নাম "গরুড়স্তম্ভ"। উচ্চতায় ইহা রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথের সিংহাসনের সহিত সমান। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন যে মহাপ্রভু মন্দির মধ্যে প্রবেশ

করিয়া ভাবে এতই বিহ্বল হইয়াছিলেন যে গরুড়স্তম্ভকেই জগন্নাথ বোধে সজোরে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

"গরুড়ের স্তম্ভ গিয়া আঁকড়ি ধরিলা।
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিলা॥"

ইহার নিকটস্থ নাটমন্দিরের প্রস্তরনির্ম্মিত দেওয়ালে তিনটি ছোট গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ এই যে, চৈতন্যদেব এই স্থানে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক জগন্নাথ দর্শন করিতেন। একাদিক্রমে অষ্টাদশ বর্ষকাল তাঁহার অঙ্গুলি স্পর্শদ্বারা পাষাণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এই তিনটী গহ্বর সৃজন করিয়াছে। নাটমন্দির দৈর্ঘ্যে ৪৬ হাত। নাটমন্দির ও জগমোহন এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এক খণ্ড সুবৃহৎ লম্বা কাঠের খুঁটি আড়াআড়িভাবে অবস্থিত আছে। যাত্রীর ভিড় হইলে এককালে যাহাতে অধিক লোক রত্নবেদীর নিকট যাইতে না পাবে, তাহার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। এই অবরোধের পরেই একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃহৎ দ্বার অবস্থিত। ইহা "জয়বিজয় দ্বার" নামে পরিচিত। এই দ্বার একবার বেলা দুইটার সময়ে এবং গভীর রাত্রিতে আর একবার রুদ্ধ করা হয়। অপরাহ্নে ও প্রত্যূষে দ্বার উন্মোচিত হইলে লোকে দেব-দর্শন করিতে পায়। জগন্নাথদেব অধিক রাত্রিতে শয়ন করিলে জয়বিজয় দ্বার রুদ্ধ হয় এবং প্রধান পাণ্ডা মন্দিরের শীলমোহর দরজার উপর লাগাইয়া দেন। একটি পিত্তলের প্রতিমূর্ত্তি রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দুই জন লোক প্রতিহারিরূপে সমস্ত রাত্রি তথায় অবস্থিতি করে। প্রত্যূষে ৫টার সময় প্রধান পাণ্ডা স্বয়ং আসিয়া শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করেন এবং সেই সময়ে ঠাকুরের "মঙ্গল আরতি" আরম্ভ

হয়। পাছে ঠাকুরের দেহস্থিত বহুমূল্য বসন-ভূষণাদি এবং তৈজসপত্র চুরী যায়, সেই জন্য দ্বার রুদ্ধ করিবার এইরূপ কড়াকড়ি বন্দোবস্ত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে পাহারা দিবার জন্য একদল পুলিস নিযুক্ত আছে, তাহারা টেম্পল্ পুলিশ (Temple Police) নামে পরিচিত। রাত্রি ২টার পর মন্দিরের পুলিস ও প্রতিহারিদ্বয় ব্যতীত অপর কেহই মন্দিরের মধ্যে থাকিতে পারে না। এই সময়ে মন্দির-প্রবেশের চারিটি দ্বারই রুদ্ধ করা হয়। এই গভীর রাত্রিতে দেবতাত্রিয় সিংহাসনের সম্মুখে স্থাপিত বহুমূল্য বিচিত্র শয্যাভূষিত খট্টাঙ্গের উপর সুখে নিদ্রাগমন করেন।

রত্নবেদী ও ত্রিমূর্ত্তি।

শ্রীমন্দিরের যে অংশে ("বিমান") রত্নবেদী প্রতিষ্ঠিত, তাহা দিবা-ভাগেও গাঢ় অন্ধকারময়। তথায় দিবারাত্রি পুন্নাগ-তৈলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোক উজ্জ্বল না হইলেও তাহারই সাহায্যে যাত্রিগণকে দেবদর্শন করিতে হয়। কতকগুলি প্রস্তরময় সোপান অবতরণ করিয়া রত্নবেদীতে পৌঁছিতে হয়। এই সিঁড়িগুলি অতিশয় পিচ্ছিল, নামিবার সময়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। ধূপ, ধুনা এবং সুরভি পুষ্পের সৌরভে ঐ স্থান সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে। রত্নবেদীর উপর ত্রিমূর্ত্তি, পুষ্পাভরণ, মণিময় মুকুট, বিবিধ রত্নালঙ্কার এবং বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুদর্শনের সহিত বিরাজ করিতেছেন। জগন্নাথ কৃষ্ণবর্ণ, সুভদ্রা পীতবর্ণ এবং বলরামের দেহ শুভ্রবর্ণ। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, যদি কোন যাত্রী প্রথমে জগন্নাথের মুখ না দেখিয়া বলরামের মুখ দেখে, তাহা হইলে এক বৎসরের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। আমার স্বর্গগতা মাতাঠাকুরাণী পুরী হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে,

এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই তাঁহার মৃত্যু হইবে, কেন না মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই বলরামের মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছিল। সুভদ্রাদেবী মহাভারতে কৃষ্ণের ভগিনীরূপে পরিচিত থাকিলেও তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাবতীয় উৎসবে লক্ষ্মীর স্থান অধিকার করিয়া থাকেন। এ স্থানে জগন্নাথের প্রতিনিধি যেমন "মদনমোহন", তদ্রূপ সুভদ্রার প্রতিনিধির কার্য্য "লক্ষ্মী"র দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

দেব-দর্শনের পর মন্ত্র পাঠ করিয়া রত্নবেদী সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। রত্নবেদীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ভক্তবৃন্দের ভক্তিবিগলিত হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ও জয়ধ্বনি শ্রবণ করিলে নিতান্ত অবিশ্বাসী ব্যক্তির অন্তঃকরণও মুহূর্ত্তের জন্য সরস ও নন্দিত হইয়া উঠে।

জগমোহনের উত্তরপ্রান্তে একটী প্রকোষ্ঠ আছে। ঠাকুরের ধন সম্পত্তি এই গৃহের মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দুই প্রাকারের অভ্যন্তর প্রদেশে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে নানা দেবদেবীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। ইঁহাদিগের মধ্যে কয়েকটী দেবতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"বিমলা" পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তি, কিন্তু ইঁহার পদতলে শিব বা গলদেশে মুণ্ডমালা নাই। দক্ষযজ্ঞের অবসানে সতীদেহ ছিন্ন হইলে তাঁহার নাভিদেশ এই স্থানে পতিত হয়, সুতরাং ইহা "একান্ন পীঠের" মধ্যে একটী পীঠস্থান। বিমলার মন্দিরও মূলমন্দিরের ন্যায় "জগমোহন", "নাটমন্দির ও
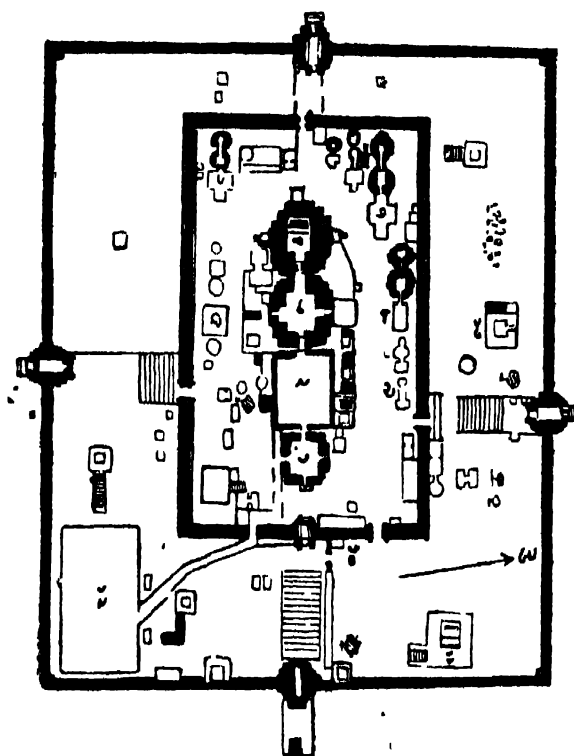
বিমলা।

মন্দির-প্রাঙ্গনের নক্সা।

(১) ভোগমণ্ডপ।

(২) নাটমন্দির।

(৩) জগমোহন।

(৪) বিমান।

(৫) মুক্তিমণ্ডপ।

(৬) বিমলার মন্দির।

(৭) মহালক্ষ্মীর মন্দির।

(৮) ধর্ম্মরাজের মন্দির।

(৯) পাতালেশ্বরের মন্দির।

(১০) আনন্দ বাজার।

(১১) স্নানবেদী।

(১২) রন্ধনশালা।

(১৩) বৈকুণ্ঠ।

"ভোগমণ্ডপ" সমন্বিত। অতি অপ্রশস্ত পথ দিয়া কয়েকটি প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়া দেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা তান্ত্রিকদিগের প্রিয় স্থান। তান্ত্রিকেরা বলেন যে বিমলা দেবীই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, জগন্নাথ দেব তাঁহার ভৈরব মাত্র। বৎসরের মধ্যে মহাষ্টমীর দিনে এখানে একটী ছাগ-বলি হইয়া থাকে।

মহালক্ষ্মী।

"মহালক্ষ্মীর" মন্দির বিস্তৃত ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন এবং মূল মন্দিরের ন্যায় চারি অংশে বিভক্ত। মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃশ্য একটি "নাটমন্দির" ইহার সম্মুখে অবস্থিত। ইহার ছাদ একটিমাত্র খিলানে গঠিত এবং কতকগুলি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। হিরণ্যকশিপুবধ এবং শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বিবিধ চিত্র নাটমন্দিরের দেওয়ালে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই স্থানটি অতি মনোরম, যাত্রিগণ অল্লাধিককাল এই স্থানে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহার গাত্রে অনেক দেবদেবী ও পৌরাণিক ঘটনার চিত্র খোদিত আছে। ইহা মূলমন্দিরের উত্তর-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত।

সত্যভামা।

রাধাকৃষ্ণ।

সত্যভামার মন্দির বিমলা ও মহালক্ষ্মীর মন্দিরেরই তদ্রূপ। অনেকগুলি দরজা পার হইয়া এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। নিকটেই একটি ছোট মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

অক্ষয়বট।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বৃহৎ বটবৃক্ষের নিম্নে "বটকৃষ্ণ" ঠাকুর অবস্থিতি করিতেছেন। এই বৃক্ষ "অক্ষয়বট" নামে প্রসিদ্ধ। কত বন্ধ্যা স্ত্রীলোক পুত্রলাভমানসে এই বৃক্ষের তলদেশে আঁচল পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছে। একটীমাত্র

ফল যে স্ত্রীলোকের অঞ্চলে পতিত হইবে, সে উহা ভক্ষণ করিলে তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ দূর হইবে বলিয়া বিশ্বাস।

শ্রীমন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে এবং জগমোহনের দক্ষিণভাগে "মুক্তিমণ্ডপ।" ইহার পরিসর দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ২৫ হাত।

মুক্তিমণ্ডপ।

এখানে শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ নিয়ত শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। যে সকল ব্রাহ্মণ পুরীতে দান গ্রহণ করেন না, তাঁহারা এই স্থানে বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজা প্রতাপরুদ্র ১৬শ শতাব্দীতে ইহা নির্ম্মাণ করেন।

পশ্চিম দ্বারের বামদিকে একটী ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। ইহা জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধি "মদনমোহনের" আবাসস্থান।

নিকটেই "রোহিণীকুণ্ড।" এই কুণ্ডের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত

রোহিণীকুণ্ড।

একখানি চক্র, কাকের ন্যায় একটী পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি এবং দুইখানি পাদপদ্ম রক্ষিত হইয়াছে। পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি চতুর্হস্তবিশিষ্ট। "ভূষণ্ডী" নামক এক কাক এই কুণ্ডে পতিত হইয়া চতুর্ভুজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রস্তরময় পক্ষিমূর্ত্তি ভূষণ্ডী কাকের। ইহা পুরীর পঞ্চ তীর্থের মধ্যে অন্যতম।

একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে কঙ্কালসার একাদশী ঠাকুরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

একাদশী।

রহিয়াছে। পুরীতে ইঁহার অদৃষ্টে বার মাসই উপবাস। নিষ্ঠাবতী হিন্দু-বিধবাগণেরও পুরীতে একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস স্থানীয় আচার বিরুদ্ধ।

এই মন্দিরের মধ্যে পিত্তলনির্ম্মিত সূর্য্য, চন্দ্র, প্রভৃতি কতিপয়

ধর্ম্মরাজ।

জ্যোতিষ্কগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একটি অষ্টধাতু নির্ম্মিত। এই দেবমূর্ত্তিগুলির উপরে

ধর্ম্ম বা সূর্য্য-নারায়ণের মূর্ত্তি অবস্থিত এবং তৎপাদদেশে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্ম্মিত ধ্যান বুদ্ধমূর্ত্তি।

ইতঃপূর্ব্বে নাটমন্দিরের সম্মুখে ভোগমণ্ডপের উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভোগমণ্ডপ।

দিবসের বিভিন্ন সময়ে ঠাকুরের যে বিভিন্ন প্রকার ভোগ প্রস্তুত হয়, তাহা রন্ধনশালা হইতে নাকে মুখে বস্ত্রবদ্ধ বাহকগণ কর্ত্তৃক গুপ্ত পথ দিয়া আনীত হইয়া এই স্থানে রক্ষিত হয় এবং যথাসময়ে যথাবিধি ঠাকুরের সমীপে নিবেদিত হইয়া থাকে।

হস্তীদ্বারের নিকট "বৈকুণ্ঠধাম"। ইহা দ্বিতল। এখানে যুগান্তে

বৈকুণ্ঠ।

ঠাকুরের "নব কলেবর" মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এ স্থানে যাত্রিগণ টাকা জমা দিয়া "আটকিয়া" বাঁধিয়া থাকে।

পাতালেশ্বরের মন্দিরের কিয়দংশ ভূগর্ভে অবস্থিত। কতকগুলি

পাতালেশ্বর।

সোপান বাহিয়া নিম্নে গমন করিলে দেব-দর্শন হয়। এই মন্দিরের দেবতা একটী শিবলিঙ্গ। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ অন্ধকারময় ও স্যাঁতসেঁতে। এখানে একখানি শিলালিপি আছে।

স্নানের বেদী আনন্দবাজারের উত্তর-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত, প্রশস্ত

স্নানবেদী।

এবং রেলিং দিয়া বেষ্টিত। ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আর একটী বেদী অবস্থিত রহিয়াছে। স্নানযাত্রার সময়ে দেবতাদিগকে সশরীরে এই স্থানে লইয়া যাওয়া হয় এবং মন্ত্রপূত বারি তাঁহাদের মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও ছোট-খাট অনেকানেক দেবদেবী ও দেব-মন্দির শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত; বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা গেল না।

জগন্নাথদেবের দৈনিক সেবাকার্য্য যে ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, সময় ও সুবিধার অভাবহেতু তাহার ধারাবাহিক বিবরণ অনেকেরই প্রত্যক্ষভাবে জানিবার অবসর ঘটে না। ভক্তমাত্রেই ঠাকুরের সেবার কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কৌতূহল নিবারণের নিমিত্ত নিম্নে দৈনিক সেবার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

দৈনিক সেবা।

অতি প্রত্যুষে ১০।১২ জন লোক খোলকরতালের সাহায্যে প্রভাতী গান গাহিয়া ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ করে। ইহারা "দেবদূত" নামে পরিচিত। নিদ্রাভঙ্গ হইবার পর প্রধান পাণ্ডা শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া 'জয়বিজয়' দ্বার উন্মোচন করেন এবং "মঙ্গলারতি" আরম্ভ হয়। তখন ঠাকুর রাত্রিকালের "রাজবেশেই" সজ্জিত থাকেন। বাদ্যোদ্যমের সহিত পুষ্পমাল্য-শোভিত দীপাবলী-সাহায্যে দেবারতি সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(১) মঙ্গলারতি।

মঙ্গলারতির পরেই "অবকাশ"। এই সময়ে ঠাকুরের দন্তধাবন, স্নান প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এক একটী দাঁতন, জিভ্ছোলা, দাঁতখুটা প্রভৃতি দন্তধাবনের বিবিধ উপকরণ এক এক জন পাণ্ডা প্রত্যেক ঠাকুরের সম্মুখে কিছুক্ষণ ঘুরাইয়া দন্তধাবনক্রিয়া সম্পাদন করে। ইহার জন্য তিন জন পাণ্ডা তিন ঠাকুরের সম্মুখে আসন পাতিয়া উপবেশন করে এবং নিকটে রক্ষিত তিনটী রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রে (গাম্‌লা) দন্তধাবনের পর ঐ সকল সরঞ্জাম নিক্ষেপ করে।

(২) অবকাশ ও স্নান।

অতঃপর এক একখানি দর্পণ প্রত্যেক বিগ্রহের সম্মুখে স্থাপন করিয়া দর্পণস্থ প্রতিফলিত মূর্ত্তির উপর দধি ও শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে তিন ঠাকুরের স্নান সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্নানের পর সূর্য্য বা "দ্বারপাল" পূজা সম্পন্ন হয়।

(৩) বাল্যভোগ।

প্রাতঃকালে ঠাকুরকে যে ভোগ দেওয়া হয়, তাহার নাম "বাল্যভোগ"। এই ভোগের সামগ্রী মুড়্‌কি, মাখন, মিছ্‌রি, দধি ও মিষ্টান্ন। যে কোন ভোগের সময়ে মন্দিবের দ্বার রুদ্ধ করা হয়; ভোগ শেয হইলে দরজা খোলা হয় এবং দর্শকগণ পুনরায় ঠাকুরদর্শনের আনন্দ উপভোগ করে।

(৪) সকাল ধূপ বা রাজভোগ।

বাল্যভোগের পর "সকাল ধূপ"। "ধূপ" শব্দ শ্রীক্ষেত্রে ভোগ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরীর রাজা "সকাল ধূপের" ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহার অপর নাম "রাজভোগ"। এই ভোগের যাবতীয় সামগ্রী ভোগান্তে রাজ-বাটীতে প্রেরিত হয়। এই ভোগের প্রধান উপকরণ খেচরান্ন। নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবাদিগের কর্ত্তৃক হিং অশুদ্ধ সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইলেও জগন্নাথের ভোগের খিচুড়ী হিং দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(৫) ছত্রভোগ।

"ছত্রভোগ"ই ঠাকুরের প্রধান ভোগ। যাত্রিগণের এবং পুরীর অধিকাংশ লোকের মধ্যাহ্নভোজন এই ভোগের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহা প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং ইহার উপকরণের সংখ্যাও অল্প নহে। ভাত, দাল, ভাজা, মোহর, বেশর, রাইতা প্রভৃতি বিবিধ ব্যঞ্জন, খট্টা বা আম্বিড়, দধি, ক্ষীর, পিষ্টক, পায়সান্ন ও নানাবিধ মিষ্টান্ন ছত্রভোগের উপকরণ। "মোহর" ও "বেশর" নামক দুইটী ব্যঞ্জন, যথাক্রমে

গোলমরিচের গুঁড়া এবং সরিষাবাটা মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। "মোহর" অপেক্ষা "বেশর" অধিক মুখরোচক। এখানে গোলআলু, লাউ, পুঁইশাক, সজিনাশাক প্রভৃতি তরকারি ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না। দেশী ও বিলাতী কুমড়া, বেগুণ, শকরকন্দ আলু, খাম আলু, কামরাঙ্গা, কচু প্রভৃতি ভোগের ব্যঞ্জনের উপকরণ। লাউয়ের পরিবর্ত্তে বিলাতী বা দেশী কুমড়ায় "রাইতা" প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ছত্রভোগের জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা সাধারণের প্রয়োজনভেদে বিবিধ শ্রেণীর চাউলে প্রস্তুত হইয়া থাকে। "কণিকা" প্রসাদই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্নভোগ। ইহার মূল্য অধিক বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ইহা ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না; অবস্থাপন্ন লোকই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাকে আমাদের দেশের "ঘি-ভাত" বলা যাইতে পারে। উৎকৃষ্ট আতপ তণ্ডুল, ঘৃত ও কন্দ (এক প্রকার পাটালি গুড়), মেওয়া ও মসলার সহিত মিশ্রিত করিয়া এই অন্নভোগ প্রস্তুত করা হয়। ইহা শুভ্রবর্ণ, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু ও ঝরঝরে অর্থাৎ একটী ভাত অপরটীর সহিত জড়াইয়া থাকে না। তবে আমাদের দেশের পোলাও বা ঘি-ভাতের ন্যায় ইহাতে অধিক পরিমাণে ঘি দেওয়া হয় না।

জগন্নাথের ভোগের দাল অতি সুন্দরভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বান্না দালের মধ্যে একটী বীজও পৃথক দেখিতে পাওয়া যায় না এবং উহা চাপক্ষীরের ন্যায় ঘন করা হয়। ইহা খাইতে বেশ সুস্বাদু। অরহর, মুগ, ব্রীহি, (বীরি বা কলাই) এবং বুট (ছোলা) এই চারি প্রকার দাল ভিন্ন অন্য কোন দাল জগন্নাথের ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কলাইদালে নানাবিধ পিষ্টক ও মিষ্টান্ন দ্রব্য

ভোগার্থে প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল প্রধান প্রধান পিষ্টক, মিষ্টান্ন ও দুগ্ধঘটিত সামগ্রী ছত্রভোগের জন্য নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাদেব নাম ও উপাদান সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হইল। জগন্নাথেব ভোগেব যাবতীয় সামগ্রী ঘৃতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, উহার জন্য কোনরূপ তৈল ব্যবহৃত হয় না।

পিষ্টকশ্রেণী।

১। বীরিতাড়িয়া। ইহা ব্রীহি বা কলাইদালে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই পিষ্টক বৃত্তাকাব, চেপ্টা ও পুরু, আমাদেব কলাইদালের বড়াব মত, কিন্তু সেরূপ মুখরোচক নহে।

২। ছানাতাডিযা। ইহা আমাদের দেশেব ছানার "মালপো"ব ন্যায়, খাইতে বেশ সুস্বাদু।

৩। তমানু। চালেব গুঁড়িব তৈয়াবি এক প্রকাব মাল্পো।

৪। বীরিবড়া। ইহাও কলাই দাইলের এক প্রকাব বড়া। ইহাতে লবণ বা কোন প্রকার মসলা দেওয়া হয না।

৫। হংসকেলি। কলাইদালেব ঘৃতপক্ক ফুলুরি।

৬। চন্দ্রকান্তি। কলাইদালেব মাল্পোবিশেষ।

৭। মাঠপুলি। কলাইদালেব পুলিপিঠা।

৮। কাকরা। ময়দা ও চাউলের গুঁড়ি একত্রে মিশ্রিত করিয়া এই পিষ্টক প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিঠা কাকরায় গুড় দেওযা হয়।

৯। চড়ুইনেদা। সকল প্রকার পিষ্টকের কাঁচা উপাদানের পরিত্যক্তাংশ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

১০। শোয়ার (সুপ-কার) পিঠা। চাউলের গুঁড়ি ও কলাইদালের বেশম এই পিষ্টকের উপাদান।

মিষ্টান্নশ্রেণী।

১। খাজা।
২। মগধলাড়ু।
৩। জগন্নাথবল্লভ।
তিনটিই উত্তম মিষ্টান্ন; সুজী, চিনি ও ঘৃত সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

৪। লক্ষ্মীবিলাস। ইহা এক প্রকার মিঠা লুচি। ময়দার সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া লুচির আকারে ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া হয়।

৫। খয়েরচুর। চাউলের গুঁড়ি ও গুড় একত্র মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত কঠিন, চর্ব্বণ করিতে দাঁতকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হয়। এক বৎসর থাকিলেও ইহা বিকৃত হয় না। জগন্নাথের প্রসাদরূপে ইহা দেশ-বিদেশে বিতরিত হইয়া থাকে।

৬। মনোহর বা কট্‌কটি। খয়েরচুরের ন্যায় চাউলের গুঁড়ি ও গুড় ইহার উপাদান এবং প্রকৃতিতেও উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

৭। কোরা। ইহা আমাদের দেশের রসকরার ন্যায়। নারিকেল ও চিনি ইহার উপাদান।

৮। খোর্মা। মিষ্টরহিত এক প্রকার গজা।

৯। নুণখোর্মা। ইহা আমাদের দেশের নিম্‌কির ন্যায়। খোর্মা ও নুণখোর্মা উভয়েরই উপাদান ময়দা ও ঘি।

১০। গজা। ময়দা, চিনি ও ঘৃতে প্রস্তুত, আমাদের দেশের গজা অপেক্ষা অধিক কঠিন।

১১। ঝিলি। আমাদের দেশের জিলাপির ন্যায়, রসে ফেলা।

পুরাধামে।

১২। আরিষা। ইহা আমাদের দেশের গুড়পিঠার ন্যায়। চাউলের গুঁড়ি ও গুড় একত্র মিশাইয়া ঘৃতে ভাজিয়া লওয়া হয়।

জগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রকার মিষ্টান্নভোগ পাণ্ডা ও যাত্রিগণ কর্ত্তৃক বহু দূরদেশে নীত ও বিতরিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ মিষ্টান্ন বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃতাবস্থায় থাকে।

দুগ্ধঘটিত মিষ্টান্ন।

১। অমৃতরসাবলী। ময়দার ছোট ছোট লুচি, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া লইয়া এই দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

২। চকোটা। দুধ, ছানা, কলা ও চিনি একত্র মিশ্রিত করিয়া রাবড়ির ন্যায় ঘন করিয়া লওয়া হয়।

৩। ক্ষীরি। ইহা চাউলের পরমান্নবিশেষ।

৪। গুরুন্দা (১নং)। ইহা দুধের সর, চিনির সহিত পাক করা।

৫। গুরুন্দা (২নং। ইহা আমাদের দেশের রাবড়ির ন্যায়।

৬। ক্ষীরা। ঘন দুধের ক্ষীর।

ছত্রভোগের পর "মধ্যাহ্নধূপে"র ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই ভোগের ব্যবস্থার ভার পুরীর রাজার উপর ন্যস্ত। পূর্ব্বে রাজা প্রতিদিন ১২৫৲

(৬) মধ্যাহ্ন-ধূপ। টাকা ইহার খরচস্বরূপ প্রদান করিতেন। আমি যখন পুরী গমন করিয়াছিলাম, তখন এই ভোগের জন্য প্রত্যহ ২০০৲ টাকা খরচের ব্যবস্থা ছিল। ইহাও নানা উপকরণ-সমন্বিত অন্নভোগ। এই ভোগের অধিকাংশ সামগ্রীই রাজার বাটীতে প্রেরিত হয়, কিয়দংশমাত্র পাণ্ডাদিগের প্রাপ্য। পাণ্ডারা অনেকেই

তাহাদের অংশ "আনন্দবাজারে" বিক্রয় করে এবং জনসাধারণে উহা তথা হইতে ক্রয় করিয়া ব্যবহার করে।

"মধ্যাহ্নধূপ" শেষ হইলে ঠাকুরের দিবাভাগে বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বেলা ৩টার সময় ঠাকুর শয়ন করেন। সেই সময় দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই জন্য অপরাহ্নে যাত্রিগণ ঠাকুরের দর্শনলাভ করিতে পারে না। সন্ধ্যার সময় দ্বার উন্মোচিত হইলে সাধারণে পুনরায় ঠাকুরকে দর্শন করিতে পায়।

(৭) শয়ন।

"সন্ধ্যারতি" ঠিক মঙ্গলারতির মত। ইহা দেখিবার জন্য মন্দিরে বিস্তর লোকের সমাগম হয়। বাদ্যোদ্যমের সহিত পুষ্পমাল্যপরিশোভিত দীপাবলী সাহায্যে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া এই আরতিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৮) সন্ধ্যারতি।

আরতির পরেই ঠাকুরের বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহার নাম "সন্ধ্যাধূপ"। এই ভোগের উপকরণ অন্ন, মিষ্টান্ন, ফলাদি, দুগ্ধ, ক্ষীর, সর ইত্যাদি।

(৯) সন্ধ্যাধূপ।

ইহার পরে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লাগাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করা হয়। পুষ্পমাল্য এবং পুষ্পালঙ্কারে তাঁহাদের দেহ সজ্জিত করিয়া বিচিত্র বসন-ভূষা তাঁহাদিগকে পরাইয়া দেওয়া হয়। এক্ষণকার এই বেশকে "শৃঙ্গারবেশ" কহে।

(১০) চন্দনলাগি।

অধিক রাত্রিতে ঠাকুরের পুনরায় বেশ পরিবর্ত্তন করা হয়। এই সময়ে ঠাকুর বহুমূল্য বসন-ভূষণ এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া রমণীয় বেশে অতি মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তগণের হৃদয়ে অপার আনন্দের সঞ্চার করিয়া

(১১) বড়শৃঙ্গার বেশ।

থাকেন। এই বেশের আর একটী নাম "রাজবেশ"। এই বেশে ঠাকুরকে দর্শন করা ভক্তগণের একান্ত বাঞ্ছনীয়, এই জন্য অধিক রাত্রি হইলেও অনেকানেক ভক্ত যাত্রী রাজবেশে সজ্জিত দেবদর্শনাভিলাষে মন্দির মধ্যে অপেক্ষা করিয়া থাকে। এই সময়ে মন্দিরের মধ্যে নৃত্যগীতের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু যাত্রিগণ গান শ্রবণ করে মাত্র, নৃত্য দেখিতে পায় না; নর্ত্তন গোপনে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নৃত্য করিবার জন্য অনেক "দেবদাসী" নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারা এই কার্য্যে দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত শৈশবাবস্থায় মন্দিরমধ্যে আনীত হয় এবং যাবজ্জীবন এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করে। ইহাদিগের ভরণ-পোষণ মন্দিরের তহবিল হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহারা "কুমারী" বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। দুঃখের বিষয় ইহাদের মধ্যে অনেকেরই স্বভাব-চরিত্র বিশুদ্ধ নহে। উত্তর-ভারতের দেবমন্দিরসমূহে দেবদাসী কর্ত্তৃক নৃত্যগীতপ্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত নাই, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ দেবস্থানেই এই প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রথা যে অনেক দোষের আকর এবং ইহা যে আমাদের দেবালয়সমূহের একটি বিষম কলঙ্কস্বরূপ, তাহা বোধ হয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদিগের দেবালয় হইতে যাহাতে এই কুপ্রথা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক হিন্দুরই সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া উচিত।

"রাজবেশ" ধারণের পর পুনরায় ঠাকুরের ভোগের ব্যবস্থা করা হয়। ইহা "বড় শৃঙ্গারধূপ" নামে পরিচিত। "দই-পকাল", দুগ্ধ ও বিবিধ মিষ্টান্ন এই ভোগের উপকরণ। টাট্‌কা ভাত জলে ধৌত করিয়া তাহার সহিত দধি, আদা ও জিরাভাজা মিশ্রিত করিয়া "দই-পকাল" প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১২) বড় শৃঙ্গারধূপ।

জগন্নাথদেবের দৈনিক শেষ সেবা "পহুড় ধূপ" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইবার ঠাকুরেরা রাত্রির মত বিশ্রাম লাভ করেন।

(১৩) পহুড় ধূপ। রাত্রি প্রায় দ্বি-প্রহরের পর এই সেবার আয়োজন হইয়া থাকে। তিনটি বিগ্রহের সম্মুখে শয্যাসমেত এক একখানি ছোট রৌপ্যনির্ম্মিত খাট স্থাপন করা হয় এবং এক জন পাণ্ডা অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়া খাটগুলির উপর এবং চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ করিতে থাকে। প্রধান পাণ্ডা 'জয়বিজয়' দ্বারের সম্মুখে একটি পিত্তলের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া "পহুড় ধূপ", মূর্ত্তির সম্মুখে রক্ষা করেন এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহাতে মন্দিরের শীলমোহর লাগাইয়া দেন। রুদ্ধ দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই জন লোক সমস্ত রাত্রি প্রতিহারিরূপে অবস্থিতি করে। ইতঃপূর্ব্বে মন্দির-প্রবেশের সমস্ত দরজাই রুদ্ধ করা হয়। রাত্রিকালে কোন ব্যক্তির মন্দিরমধ্যে অবস্থান করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। প্রত্যূষে প্রধান পাণ্ডা স্বয়ং শীলমোহর পরীক্ষা করিয়া 'জয়বিজয়' দ্বার উদ্ঘাটন করিলে ঠাকুরের মঙ্গলারতি আরম্ভ হয়। লোকের বিশ্বাস যে 'জয়বিজয়' দ্বার গভীর রাত্রিতে রুদ্ধ হইলে দেবতারা জগন্নাথ-সম্ভাষণের জন্য মন্দিরমধ্যে আগমন করেন এবং কিয়ৎক্ষণ ঠাকুরের সহিত পাশাখেলা করিয়া প্রস্থান করেন।

এইরূপে প্রত্যহ জগন্নাথের দৈনন্দিন সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কথায় বলে "হিন্দুর বার মাসে তের পার্ব্বণ।" জগন্নাথক্ষেত্রে এই চলিত কথার যেরূপ সার্থকতা উপলব্ধ হয়, হিন্দুর আর কোন তীর্থে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরীতে এই উৎসবগুলি সাধারণতঃ "যাত্রা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সকল "যাত্রা"ই অল্পাধিক আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে "চন্দনযাত্রা," "স্নানযাত্রা," "রথযাত্রা" এবং "দোলযাত্রা"ই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ স্থলে কেবল কয়েকটী প্রধান উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

যাত্রা।

বৈশাখ মাসের প্রধান উৎসব "চন্দনযাত্রা"। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া (অক্ষয়তৃতীয়া) হইতে আরম্ভ হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত (২১ দিন) এই উৎসব চলিতে থাকে। জগন্নাথের প্রতিনিধি "মদনমোহনে"র শ্রীঅঙ্গে চন্দনলেপন করিয়া এবং তাঁহাকে বিচিত্র বসন-ভূষণ ও পুষ্পাভরণে সুসজ্জিত করিয়া শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিমকোণে অবস্থিত "নরেন্দ্র-সরোবর" নামক এক সুবৃহৎ পুষ্করিণীর তীরে জল-বিহারের জন্য লইয়া যাওয়া হয়। জগন্নাথের চলন্তী প্রতিমা মদনমোহন সুসজ্জিত চতুর্দ্দোলে বাহকস্কন্ধে গমন করেন এবং রত্নাভরণে সালঙ্কৃতা সুবেশা সুবর্ণনির্ম্মিত লক্ষ্মীপ্রতিমা গজদন্তনির্ম্মিত অপর একখানি ক্ষুদ্রতর দোলায় চড়িয়া তাঁহার অনুগমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ-পাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তির প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দোলায় গমন করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন

চন্দনযাত্রা।

সরোবরে যাইবার পথে পঞ্চপাণ্ডবের একটী আশ্রম অবস্থিত আছে।

ঠাকুর লইয়া যাইবার সময়ে একটি প্রকাণ্ড শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়। বহুলোক তূরী, ভেরী, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, দামামা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া এবং পতাকা, চামর, দণ্ড ইত্যাদি ধারণ করিয়া ঠাকুরের অগ্র-পশ্চাতে গমন করে। রাস্তা লোকে লোকারণ্য; রাজপথিপার্শ্বে অবস্থিত যাবতীয় গৃহে ঠাকুর দেখিবার জন্য বিস্তর লোকের সমাগম হইয়া থাকে। কত লোক উচ্চকণ্ঠে গান ও জয়ধ্বনি করিয়া নৃত্য করিতে করিতে শোভাযাত্রায় যোগদান করে। পথের দুই ধারে বিপণিশ্রেণী বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া লোকের নয়ন, মন ও অর্থ এককালে আকর্ষণ করিতে থাকে।

ঠাকুর 'নরেন্দ্র-সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে এবং লক্ষ্মীকে দুইখানি বিভিন্ন নৌকায় উঠাইয়া পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অবস্থিত একটী মন্দিরমধ্যে মহা সমারোহের সহিত লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় তাঁহাদিগের পূজা ও ভোগাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। উড়িষ্যার পুষ্করিণী-গুলি প্রায়ই সুবৃহৎ, সুন্দরভাবে নির্ম্মিত এবং সযত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। পুষ্করিণীর চারিধারের পাড় পাকা করিয়া ইট বা পাতর দিয়া বাঁধান, ঠিক আমাদের দেশের "গজগিরি" পুকুরের মত। প্রায় সকল পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে হরিদ্বর্ণ বিবিধ পাদপরাজি-শোভিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় ভূমিখণ্ড জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং অনেক স্থলেই এক একটী দেবমন্দির এই সকল দ্বীপের শোভা বর্দ্ধন করে। পুষ্করিণীগুলি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বহুবিস্তৃত এবং অনেক পুষ্করিণীরই জল বেশ পরিষ্কৃতা-বস্থায় থাকিতে দেখা যায়। উড়িষ্যায় পানীয়রূপে এবং ক্ষেত্রে সেচনের জন্য অধিকাংশ স্থানে পুষ্করিণীর জলই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূজাদি সম্পন্ন হইলে ঠাকুর ঠাকুরাণীকে সুসজ্জিত একখানি স্বতন্ত্র নৌকায় এবং পঞ্চপাণ্ডবকে অপর একখানি নৌকায় চড়াইয়া নৃত্যগীতের সহিত জলবিহার করিবার ব্যবস্থা করা হয়। দেবমন্দির এবং পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্ব আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং বহুসংখ্যক ভক্ত ও দর্শকবৃন্দের আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া উঠে। জলক্রীড়া শেষ হইলে ঠাকুর ও ঠাকুরাণী মন্দিরে পুনরাগমন করেন এবং মহা আড়ম্বরের সহিত তথায় তাঁহাদিগের চন্দন-স্নান, বেশ পরিবর্ত্তন, আরতি, পূজা ও ভোগাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভক্তগণ চন্দন মাখিয়া ঠাকুরদর্শন করে এবং মিষ্টান্নভোগ প্রসাদ পায়। অধিক রাত্রিতে পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া মদনমোহন ও লক্ষ্মীকে শ্রীমন্দিরে ফিরাইয়া লইয়া আনা হয়। "চন্দনযাত্রা" তিন সপ্তাহ ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ পূর্ব্বোক্ত উৎসব ও সমারোহের সহিত ইহা সম্পন্ন হয়। চন্দনযাত্রার নাম হইতে নরেন্দ্র-সরোবরের আর একটি নাম "চন্দন-পুকুর।" ইহার তীরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর (জটে বাবাজীর) সমাধি ও মঠ। পুরীর অন্যান্য মঠের সহিত ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

জৈষ্ঠের শেষ পূর্ণিমায় জগন্নাথের "স্নানযাত্রা" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে পুরীতে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। বিশেষতঃ ইহার ষোল দিন পরেই "রথযাত্রা" এবং উহাই পুরীর উৎসবরূপ কণ্ঠহারের মধ্যমণি-স্বরূপ। রথযাত্রাদর্শনার্থী বহু যাত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে পুরীতে আগমন পূর্ব্বক এই উভয় উৎসবেই যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। রথযাত্রা উপলক্ষে ট্রেণে অত্যন্ত ভিড় হয় বলিয়া আসিবার বিশেষ অসুবিধা হয়। এই অসুবিধার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য

স্নানযাত্রা।

অনেকেই স্নানযাত্রার দুই চারি দিন পূর্ব্বে পুরীতে আগমন করিয়া রথ দেখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কেবলমাত্র দুইটী উৎসব উপলক্ষে বিগ্রহদিগকে সশরীরে রত্নবেদীস্থিত সিংহাসন হইতে নামাইয়া বাহিরে লইয়া আসা হয়। ইহাদিগের একটী স্নানযাত্রা, অপরটি রথযাত্রা। রথযাত্রায় ঠাকুরেরা একেবারে মন্দিরের বাহিরে আগমন করেন। অপরাপর উৎসব প্রতিনিধি মদনমোহনের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উৎসবের দিন উষার উদ্বোধন হইতেই মন্দিরের মধ্যে এবং রাজপথে বহুদূর ব্যাপিয়া বিষম জনতা পরিলক্ষিত হয়। বেলা হইলে মানুষের ভিড় ঠেলিয়া এক পদ অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। বহুদূর হইতে সেই বিপুল জনসঙ্ঘের কণ্ঠোত্থিত গুরু-গম্ভীর আরাব ও জয়গীতি শ্রুত হইয়া থাকে। সেই বিপুল জনস্রোতের লক্ষ্য কেবল এক দিকে। শ্রীমন্দিরের প্রাকারযুগলের মধ্যস্থলে অবস্থিত ঠাকুরের উচ্চ স্নানবেদীর উপর অসংখ্য ভক্তবৃন্দ করযোড়ে নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া ঠাকুরের আগমন ব্যাকুলহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই দৃশ্য বাস্তবিকই দর্শনীয়। স্নানযাত্রার দিন প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু আকাশ মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেও ভক্তগণের সে দিকে দৃক্‌পাত নাই। ইহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় না, তাহাদিগের একাগ্রতা ও তন্ময়তার বিন্দুমাত্র অবসাদ পরিলক্ষিত হয় না।

স্নানের মঞ্চ উচ্চ ও প্রশস্ত। এই বেদী দুই অংশে বিভক্ত। অভ্যন্তরস্থ বেদী বাহিরের বেদী অপেক্ষা উচ্চ ও অল্পপরিসর এবং ইহার পশ্চাদ্ভাগ অনতি-উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। বড় বেদীর চতুর্দ্দিক রেলিং দিয়া ঘেরা; কেবল ঠাকুরদিগের প্রবেশের জন্য সম্মুখদিকে সোপানাবলী-সজ্জিত একটি পথ আছে।

সুভদ্রাদেবী বাহকস্কন্ধে আরোহণ করিয়া স্নানবেদীতে আগমন করেন, কিন্তু জগন্নাথ ও বলরাম পদব্রজে স্নানবেদীতে আইসেন। সুবৃহৎ বিগ্রহদ্বয় অত্যন্ত ভারী; সুতরাং তাঁহাদিগকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নহে। কাছি বাঁধিয়া তাঁহাদিগকে সম্মুখের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং পশ্চাৎ হইতে পাণ্ডাগণ বিগ্রহ ধারণপূর্ব্বক উহাকে পতন হইতে রক্ষা এবং সম্মুখদিকে অগ্রসর হইবার সহায়তা করে। রথের সময়েও বিগ্রহগুলিকে এই উপায়ে মন্দিরের বাহিরে আনিয়া রথে উঠাইয়া দেওয়া হয়। টানাটানির জন্য ঠাকুরেরা ধীরে ধীরে না চলিয়া এক প্রকার লম্ফ প্রদান করিতে করিতে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই ভাবে গমন করাকে "পাণ্ডববিজয়" (পাহুণ্ডি বিজয়) কহে।

এইরূপে কতক্ষণ পরে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, দামামা, কাঁড়া, কাঁসর, শঙ্খ, ঘণ্টা, বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের গভীর আরাব, পাণ্ডাগণের ও ভক্তদিগের কণ্ঠনিঃসৃত জয়ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া ঠাকুরের স্নানার্থে আগমন ঘোষণা করে। তখন সেই বিপুল জনতার মধ্যে স্নানবেদীর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য একটা প্রকাণ্ড চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সে চেষ্টা তিলমাত্র স্থানের অভাবে কেবল চেষ্টাতেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ যে, যে স্থানে ছিল সে, সেই স্থানেই রহিয়া যায় অথবা ভিড়ের ঠেলায় শূন্যে উঠিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হয় মাত্র।

বহু পরিশ্রমে ও বহু আয়াসে জগন্নাথ এবং বলরামের দারু মূর্ত্তিদ্বয়কে সোপানশ্রেণী বাহিয়া স্নানমঞ্চের উপর উত্তোলন করতঃ অভ্যন্তরস্থ বেদীর পশ্চাদ্দেশস্থিত প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন করিয়া রক্ষা করা হয় এবং পূর্ব্বদিবসে মন্দিরস্থিত "সর্ব্বতীর্থ" নামক কূপ হইতে উত্তোলিত এক

শত আটটি তাম্র কলসে রক্ষিত, কুসুম-সুরভি-সমৃদ্ধ, স্নিগ্ধশীতল, মন্ত্রপূত বারিধারা প্রাচীরের উপর হইতে তাঁহাদিগের মস্তকে ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই সঙ্গে "রোহিণীকুণ্ড" হইতে উত্তোলিত জলও তাঁহাদিগের মস্তকে বর্ষণ করা হয়। এই সময়ে ঠাকুরদিগের অঙ্গ স্পর্শ করিবার এবং তাঁহাদিগের পরিহিত রঙ্গীন বস্ত্রখণ্ডের অংশ লইবার জন্য যাত্রিগণের মধ্যে একটা বিষম ব্যাকুলতা ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যাত্রিগণ কেবল স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়, অপর সময়ে দেবদেহ-স্পর্শ-সুখ ভক্তগণের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই উপলক্ষে পাণ্ডাগণ বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। যাত্রিগণের নিকট হইতে বেশ বড় রকমের দর্শনী আদায় করিয়া তাহারা ঠাকুরের অঙ্গস্পর্শ করিবার সুবিধা করিয়া দেয়। অধিক জনতা হেতু এই পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্য অনেককে মন্দিরে সমস্ত দিন অপেক্ষা করিতে হয়। ঠাকুরের দেহ হইতে বস্ত্রের টুকরা সংগ্রহ করা বিশেষ পুণ্যের কার্য্য। স্নানযাত্রার সময়ে যাত্রী মাত্রেই ইহা লাভ করিবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

স্নানবেদী উচ্চ বলিয়া মন্দিরের বাহির হইতেই অধিকাংশ লোকেরই স্নানক্রিয়া সন্দর্শন করিবার সুবিধা হয়। স্নানের পর জগন্নাথকে "গণেশবেশে" সজ্জিত করা হয়। সে দিন মন্দিরের বাহিরে স্নানবেদীর উপর ঠাকুরেরা সমস্ত দিন অবস্থান করেন। এই স্থানেই তাঁহাদিগের পূজা, ভোগ, আরতি প্রভৃতি নিত্যসেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

স্নানের পরদিন ঠাকুরের জ্বর হয় এবং ১৫ দিন এই জ্বরের বিরাম হয় না। ঠাকুরকে এই সময়ে মন্দিরমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং নানাবিধ পাচন সেবন করিবার বিধিব্যবস্থা করা হয়। এই ১৫ দিন কেহ ঠাকুরের দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয় না এবং নিত্য ভোগ-

পূজাদি পট সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, এই কয়দিন রুদ্ধ মন্দিরে বিগ্রহগণকে রাখিয়া তাঁহাদিগের দেহে নূতন করিয়া রং দেওয়া হয়। এক পক্ষকাল অতীত হইলে তাঁহাদিগকে পথ্য দেওয়া হয় এবং তাঁহারা সুস্থ হইয়া "নবযৌবন-বেশ" ধারণ করতঃ ভক্তগণকে পুনরায় দর্শন দেন। স্নানযাত্রার সময় হইতে রথযাত্রার সময় পর্য্যন্ত ঠাকুরেরা আর রত্নবেদীর উপর অবস্থিতি করেন না। "জগমোহনের" সম্মুখে জয়বিজয় দ্বারের পশ্চাদ্ভাগে তাঁহাদের বিগ্রহ রক্ষা করা হয়।

শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় স্নানযাত্রা উপলক্ষে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্বাস, তৎপ্রণীত "পুরীর চিঠি" নামক পুস্তকে মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় যেরূপ সরল ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, ভক্ত পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জনের জন্য এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া বিশ্বপ্রভু সে দিন সত্যই যেন বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। যাঁহার ধ্যান-কল্পিত মূর্ত্তি আমরা সতত নয়নের সমক্ষে স্থাপন করিয়া, পুষ্পপাত্রে অর্চ্চনা করিয়া, মনোমত বেশে সাজাইয়া, প্রীতিকর সুপবিত্র দ্রব্যসম্ভারে আপ্যায়ন করিয়া পরম চরিতার্থতা অনুভব করি, আজ তাঁহাকে রুদ্ধ মন্দিরের বদ্ধ প্রকোষ্ঠের পরিবর্ত্তে সীমাহীন নভোমণ্ডলের চির-উদার বিস্তৃতির তলে গৌরব-মণ্ডিত প্রভুর বেশে অধিষ্ঠিত দেখিয়া সত্যই বিশ্বরাজের প্রভায় উদ্ভাসিত বলিয়া মনে হইল। তখন ভক্তিবিহ্বল পুলকিত চিত্তে সরিয়া দাঁড়াইলাম। মনে হইল, এ কি! কাহাকে আমরা তুচ্ছ

প্রস্তরমন্দিরের মধ্যে বদ্ধ রাখিয়া নিতান্ত আপনার জনের মত আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি! আজ সীমার বাধা হইতে অবসর লইয়া আপন বিশাল অনন্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের নিতান্তই আপনার জগন্নাথ সমগ্র বিশ্ববাসীর হইয়া আবির্ভূত হইলেন। আজ সারা বিশ্ব তাঁহার আরতির আয়োজন করিতেছে। মেঘগর্জ্জনের গম্ভীর আবাহনে তাঁহারই প্রার্থনা-গীতি ফুটিয়া উঠিতেছে। বিজলীর চকিত আলোকে তাঁহারই আরতি-প্রদীপ দিকে দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। ঝরঝর ধারে বাদলের বারিরাশি আজ বিশ্বনাথের চরণতলে অর্ঘ্যবর্ষণ করিয়া জগৎ-সমীপে আপনাকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়া তুলিতেছে। শীকর-সিক্ত-বায়ু আজ দেবদেবের জীবন্ত সত্তার মধুময় স্পর্শ আপনার উন্মুক্ত হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে শিহরিয়া সভয়ে শ্রীঅঙ্গে চামর ব্যজন করিতেছে।”

“বিশ্বের এই মহামহিমময় আকুল আরতি-আয়োজনের অন্তরালে মানবের ভক্তি-আহরিত পুষ্পসম্ভার কত তুচ্ছ! ডুবিয়া গিয়াছে মানবের শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, নিভিয়া গিয়াছে তুচ্ছ প্রদীপের ক্ষীণ আলোকরশ্মি। আজ দারুমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথের মধ্যে অখিল বিশ্বপতির মহিমাই প্রতিভাত দেখিলাম। ভয়ে, বিস্ময়ে, ভক্তিতে মন ভরিয়া গেল, অশ্রুপূরিতনেত্রে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণি-

পাত করিলাম। আকারের মধ্যে নিরাকার এমনি ভাবেই আপনাকে বিকসিত করিয়া তোলেন! তাহা না হইলে কি দুঃসহ হইত মানবের অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব! কোথায় থাকিত আমাদের সুখ-শান্তির প্রস্রবণ, কোথায় পাইতাম আমরা শত দুঃখ-দারিদ্র্যে অমৃতময়ের আশীর্ব্বাদ সান্ত্বনা!"

'আজ অনল অনিলে চির-নভোনীলে
ভূধর সলিলে গহনে।
আজ বিটপি লতায় জলদের গায়
শশি তারকায় তপনে।'

সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মানবাত্মার যোগস্থাপনই বিশ্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিরাট সত্ত্বা উপলব্ধি করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'গায়ত্রী' মন্ত্র সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

'"বিশ্ব-প্রকৃতি এবং মানবচিত্ত—এই দুইকে এক ক'রে মিলিয়ে আছেন যিনি, তাঁকে এই দুইয়ের মধ্যে একরূপে জান্‌বার যে ধ্যানমন্ত্র—সেই মন্ত্রটীকেই ভারতবর্ষ তার সমস্ত পবিত্র শাস্ত্রের সারমন্ত্র ব'লে বরণ করেছে। সেই মন্ত্রটিই গায়ত্রী---ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ, জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, আমাদের চেতনা---এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ কর্‌ছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত কর্‌ছে---, তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার

বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান ক'রে উপলব্ধি কর্‌বার মন্ত্র হচ্চে এই গায়ত্রী।"

তিনি আরো বলিয়াছেন :—

"তিনি যে সর্ব্বত্রই। আর তিনি যে আত্মার মাঝখানেই। যিনি আত্মার ভিতরে, তাঁকেই আবার দেশে দেশে দিকে দিকে সর্ব্বত্রই ব্যাপকভাবে দেখ্‌তে পাবার যে কত সুখ—যিনি বিশাল বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্রের মধ্যে রূপ-রস-গীত-গন্ধের নব নব রহস্যকে নিত্য নিত্য জাগিয়ে তুলে সমস্তকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন, তাঁকেই আত্মার অন্তরতম নিভৃতে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি কর্‌বার কত আনন্দ! এই উপলব্ধি কর্‌বার মন্ত্রই হচ্চে গায়ত্রী। অন্তরকে এবং বাহিরকে, বিশ্বকে এবং আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত ক'রে জানাই হচ্চে এই মন্ত্রের সাধনা।"

মন যখন ভক্তি-সাগরে একেবারে ডুবিয়া যায়, আত্মা যখন বিরাট বিশ্বরূপের সত্তায় লীন হইয়া আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে, তখন ভক্তের মূর্ত্তি-অমূর্ত্তি-বিচারবুদ্ধি লোপ প্রাপ্ত হয়, তখন সাকার ও নিরাকার দুই-ই তাঁর কাছে সমান হইয়া যায়। ভক্ত তখন সসীম হইতে অসীমের রাজ্যে উপনীত হয়েন, তাঁহার দেবতা তখন আর মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-প্রস্তরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। তিনি তখন বৈচিত্র-পূর্ণ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেবল এক ব্রহ্ম-সত্তামাত্রই অনুভব করিতে থাকেন। কি সাকারবাদী কি নিরাকারবাদী, উভয়েই যদি অবহিত হইয়া এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটুকু ধীর ও উদারভাবে হৃদয়ে উপলব্ধি করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মজগতের অনেক বৃথা বাদ-বিসংবাদ

সহজেই মিটিয়া যায় এবং মানবসমাজ অনেক অত্যাচার ও অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রার পূর্ব্বের একাদশী তিথিতে মন্দিরমধ্যে "রুক্মিণীহরণ" উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা আমাদের দেশের "যাত্রা"-অভিনয়ের মত। লক্ষ্মী প্রতিমাই সে দিন বাহক স্কন্ধে সুসজ্জিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া রুক্মিণীরূপে বিমলাদেবীর মন্দিরে পূজা দিতে গমন করেন। এক জন লোক সং সাজিয়া দূতরূপে এই সংবাদ জগন্নাথের প্রতিনিধি "মদনমোহনের" নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। পূর্ব্বসঙ্কেতানুসারে দলবলের সহিত তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপে চতুর্দ্দোলে আরোহণ করিয়া বিমলা দেবীর মন্দিরের কিয়দ্দূরে সংগোপনে অবস্থিতি করিতে থাকেন। রুক্মিণী পূজা শেষ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র শ্রীকৃষ্ণের দলবল তাঁহার যান আটক করে। বিপদ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বাহকেরা ভয়ে দোলা ফেলিয়া পলায়ন করে। রুক্মিণীকে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দোলে তুলিয়া লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই এক জন লোক শিশুপাল সাজিয়া অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করে এবং দোলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মহা আস্ফালন করিতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া বাক্য ও দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয় শেষ হইলে শিশুপাল পরাস্ত হইয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় এবং মহা কোলাহলের সহিত সদলবলে রুক্মিণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর নৃত্য, গীত, বাদ্য ও জয়ধ্বনির সহিত উভয়ের উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে একাদশীতে এই উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহা "রুক্মিণী একাদশী" নামে পরিচিত। এই উৎসব উপলক্ষে মন্দিরমধ্যে খুব লোকের ভিড় হয়।

রুক্মিণীহরণ।

"আষাঢ় মাসে রথযাত্রা রথ-টানা-টানি" এই ছড়া বলিয়া বাল্যকালে আমরা কত আনন্দ উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু সে কেবল কলিকাতার বাগ-বাজারের রথ অথবা শ্রীরামপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মাহেশের রথ দেখিয়া। পুরীর রথের অথবা তথাকার রথযাত্রা-উৎসবের বিরাটত্ব আমরা তখন কল্পনার মধ্যেও আনিতে সমর্থ হইতাম না। পুরী ব্যতীত হিন্দুর আর কোন তীর্থস্থানে, রথযাত্রা ব্যতীত অপর কোন উৎসবে এরূপ জনতাবাহুল্য, এরূপ কর্ম্মচাঞ্চল্য, ভক্তির এরূপ প্রবল উচ্ছ্বাস, দেবদর্শনের জন্য প্রাণের এরূপ ব্যাকুলতা দেখা যায় কি না সন্দেহ।

রথযাত্রা।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"—রথারোহী শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া দারিদ্র্য-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-প্রপীড়িত মর্ত্ত্যধামে পুনঃ পুনঃ যাতায়াতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় লক্ষ লক্ষ বিশ্বাসী ভক্ত ভারত-বর্ষের নানা স্থান হইতে এই সময়ে পুরীতে আগমন করেন। হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবমাত্রেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে; এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হয় না। যখন রেল হয় নাই, তখন লোকে হাঁটাপথে অথবা কতকদূর জাহাজে চড়িয়া পুরীতে আসিত। এখন অধিকাংশ যাত্রীই রেলপথে পুরীতে আগমন করে। তবে অনেক দরিদ্র লোককে এবং সাধু-সন্ন্যাসীর দলকে এখনও পদব্রজে আসিতে দেখা যায়।

রথের সময় যাত্রী বহিবার জন্য রেলকর্ত্তৃপক্ষগণ গাড়ীর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই সাধারণ ট্রেণ্ ব্যতীত দুই একখানি অতিরিক্ত ট্রেণের (Special train) ব্যবস্থা করা হয়। যাত্রীর বোঝা লইয়া একখানির পর আর একখানি ট্রেণ সমস্ত দিনই পুরীর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক সময়ে কলেরা রোগ মহামারীরূপে ব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট্ পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপন দিয়া যাত্রিগণকে সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতে সৌখীন যাত্রীর সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে কমিলেও বিশ্বাসী ভক্তের সংখ্যার বিশেষ হ্রাস হইতে দেখা যায় না। এই সময়ে পুরীর স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মচারিগণ যাত্রীদিগের বাসস্থানগুলির পরিদর্শন ও সেগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যপ্রদ রাখিবার জন্য সবিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যে সকল বাসায় যাত্রীরা অবস্থান করে, তাহাদিগকে লজিং হাউস্ (Lodging House) কহে এবং তাহার সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা পরিচালন করিবার জন্য একটী আইন প্রচলিত আছে। বহু যাত্রী একত্রে এক গৃহে থাকিবার নিয়ম নাই। যে কোন গৃহে প্রত্যেক যাত্রীকে আইনমত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থান দিতেই হইবে, নতুবা বাসাবাটীর অধিকারিগণকে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সাধারণতঃ পাণ্ডাগণই এই সকল বাসাবাড়ীর অধিকারী। তাহারা ষ্টেশন হইতে যাত্রিবর্গকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি জনকে তাহাদের নিজ নিজ বাটীতে স্থান দেয়, অধিকাংশ যাত্রীরই এই সকল বাসাবাটীতে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। অন্যান্য উৎসব অপেক্ষা রথের সময়ে যাত্রীদিগের নিকট হইতে বেশী ভাড়া আদায় করা হয়, এমন কি, সময়ে সময়ে প্রত্যেক যাত্রীকে দৈনিক ৪।৫ টাকা হিসাবে ঘরভাড়া দিতে হয়। আমি যখন প্রথম পুরীতে গিয়াছিলাম, তখন এই সকল বাসাবাটীর

যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম, তাহা বিশেষ সন্তোষজনক ছিল না। ঘরগুলি প্রায় সবই চালাঘর, আয়তনে ক্ষুদ্র এবং গৃহগুলির মধ্যে আলোক ও বাতাসের বিশেষ অভাব বোধ হইয়াছিল। যথোচিত আলোক ও বায়ুসঞ্চালনের অভাবে ঘরের মেঝেও তাদৃশ শুষ্ক থাকিতে দেখি নাই। এখন বাসাবাড়ী সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে পুরী সহরে কয়েকটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় যাত্রীদিগের থাকিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব সেরিফ্, মাড়োয়ারী-সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা, যাবতীয় সৎকার্য্যে অগ্রণী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রদ্ধাস্পদ সার্ হরিরাম গোয়েন্‌কা মহোদয় বহু অর্থ-ব্যয় করিয়া শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে বড় রাস্তার উপরে একটি ত্রিতল ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি এই সুবৃহৎ সৌষ্ঠবসম্পন্ন ধর্ম্মশালা তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গগত রামচন্দ্র গোয়েন্‌কা মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মশালায় যাত্রিগণ ভাড়া না দিয়া এককালে তিন দিবস অবস্থান করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।

রথের সময়ে পুরীতে প্রায় প্রতি বৎসরেই কলেরার বিষম প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। পুরী সহরের অভ্যন্তরপ্রদেশ মোটেই পরিষ্কার ও স্বাস্থ্যকর নহে। রাস্তা-ঘাটে যেখানে সেখানে নানা প্রকার ময়লা ও আবর্জ্জনা সঞ্চিত থাকিতে দেখা যায় এবং সহরবাসী-দিগের কদভ্যাসের জন্য গৃহের আশ-পাশ ও যাতায়াতের পথ পরিষ্কৃত রাখা কঠিন হইয়া উঠে। পানীয় জলের জন্য এখানে সকলকেই কূপের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অপরিষ্কার সহরের কূপের জল কত নির্ম্মল হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া

যাইতে পারে। তদুপরি অধিকাংশ লোকের আহার "আনন্দ-বাজার" হইতে ভাত, দাল ক্রয় করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। রথের সময়ে পুরীতে মাছির বিষম উপদ্রব হইয়া থাকে এবং বাজারে খাদ্যদ্রব্যের উপর অসংখ্য মাছি বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় খাদ্য ও পানীয় যে বিবিধ-রোগ-বীজ-দুষ্ট হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এই অসম্ভব জনতার মধ্যে একটি মাত্র কলেরা রোগ দেখা দিলে, রোগ-প্রতিষেধের সাধারণ নিয়ম বিষয়ে অজ্ঞতাহেতু এবং অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্যে উক্ত রোগের সংক্রামক বীজ গৃহদাহী অগ্নিশিখার ন্যায় শীঘ্র চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার ফলে শতশত যাত্রী ঠাকুর দেখিতে যাইয়া পুরীতেই দেহরক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে কলেরা রোগের চিকিৎসার জন্য গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটী সবিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন; কিন্তু এত ভিড়ে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সুব্যবস্থা হওয়া বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। যাত্রীরা যদি বাজারে বিক্রীত অন্নের উপর নির্ভর না করে এবং পানীয় জল যদি যথারীতি সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার করে, তাহা হইলে তাহারা এই বিপদের হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। অন্ন বাসাবাটীতে প্রস্তুত করিতে এবং পানীয় জল ফুটাইয়া লইতে মোটেই কোন অসুবিধা হইবার কথা নহে, অথচ এই সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে কত বিপদ, কত ক্লেশ, কত অসুবিধা, কত মনস্তাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়। আশা করি, পুরীযাত্রিগণ এই কথাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান করিয়া উপদেশ-মত কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

রথের সময়ে পুরীতে কি অসম্ভব জনতা হয়, না দেখিলে তাহার ধারণা করা দুঃসাধ্য। স্নানযাত্রার পর শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে

ঠাকুরেরা রথে আরোহণ করেন। সেদিনকার জনতা এবং তাহার উৎসাহ, আনন্দ ও চাঞ্চল্য বাস্তবিকই দেখিবার মত। কত দূরদূরান্তর হইতে কত ক্লেশ, অনাহার, অনিদ্রা সহ্য করিয়া, যাবজ্জীবন-সঞ্চিত অর্থ-ব্যয় করিয়া, আত্মীয়-পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, শারীরিক ব্যাধি ও জরাজনিত যন্ত্রণা ও দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া, লক্ষ লক্ষ নরনারী রথোপবিষ্ট দেবতাকে একটিবারমাত্র দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য রথের দিন পুরীতে সমাগত হইয়া থাকে। যদি ত্যাগই আন্তরিক ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কোথায় দেখিতে পাইব? তাহার পর ভক্তগণ যখন ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়া, "জয় জগন্নাথ" রবে দিগ্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, পথে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া দরদরিত ধারায় প্রবাহিত প্রেমাশ্রুজলে ধরাতল সিক্ত করিতে থাকে, তখন সে ভক্তি-উচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয় যে, ভারতবর্ষে হিন্দুর তীর্থ ব্যতীত বুঝি আর কোথাও এই পবিত্র দৃশ্য দেখিবার অবসর ঘটিবে না।

রথের দিন প্রাতঃকাল হইতেই শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচাবাড়ী পর্য্যন্ত প্রায় এক ক্রোশব্যাপী সুবিস্তৃত রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। কাহার সাধ্য যে, সেই ভিড় ঠেলিয়া এক পদ অগ্রসর হয়। রাস্তার দুই পার্শ্বে অবস্থিত গৃহগুলির ছাদ, আলিসা, বারান্দা, রোয়াক, দরজা, জানালা প্রভৃতি কেবল মনুষ্য-মূর্ত্তির দ্বারা পরিপূর্ণ। গৃহস্বামীগণ এই সময়ে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। যাত্রীদিগকে বসিবার কিংবা দাঁড়াইবার স্থানের জন্য ২।১ টাকা মূল্য ধরিয়া দিতে হয়। কতশত লোক সূর্য্যোদয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই পথিপার্শ্বস্থিত বৃক্ষের শাখা প্রশাখার উপরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রথ দেখিবার জন্য বসিয়া থাকে। রাস্তার দুই পার্শ্বের বিপণিগুলি উন্মুক্ত ও সুসজ্জিত। এই

ভিড়ের মধ্যেই কেনা-বেচার খুব ধুমধাম চলিয়াছে। বাসনের দোকান, কাপড়ের দোকান, কটকের চটিজুতার দোকান, খেলানার দোকান ইত্যাদিতে লোকের ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা সুকঠিন। যাত্রীরা "রথ দেখা কলা বেচা" দুই কাজই একসঙ্গে সারিয়া লইতেছে। দোকানদারেরাও সরলপ্রকৃতির বিদেশী নূতন খরিদ্দার পাইয়া অসম্ভব মূল্যে তাহাদের দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া সংবৎসরের লাভ এক দিনেই সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে। বাস্তবিক রথের সময়ে পুরীর সর্ব্বত্রই জীবনের যে প্রবল সাড়া পাওয়া যায়, আর কোনও উৎসবে তাহা লক্ষিত হয় না।

জগন্নাথ ও বলরামের বিশালতর দারুমূর্ত্তিদ্বয়কে কাছি বাঁধিয়া মন্দির হইতে বাহির করা হয়। সুভদ্রা ঠাকুরাণী বাহকের স্কন্ধে চড়িয়া রথে আরোহণ করেন। যাত্রার সময়ে পাণ্ডাগণ বিগ্রহের পশ্চাদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়া বিগ্রহকে পতন হইতে রক্ষা করে। মন্দির হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর প্রতিনিধি আসিয়া ঠাকুরের মস্তকে অর্ঘ্য বাঁধিয়া দেন। সিংহদ্বারের সম্মুখে পূর্ব্ব হইতেই বিবিধবর্ণে রঞ্জিত সুসজ্জিত বিরাটদেহ মন্দিরাকৃতি তিনখানি রথ তিন দেবতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে। রথগুলি প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। রথের চতুঃপার্শ্বস্থিত প্রাচীর ও স্তম্ভের উপর বিস্তর দেবদেবীর মূর্ত্তি সুন্দরভাবে ক্ষোদিত থাকিতে দেখা যায়। জগন্নাথের রথ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার পর বলরামের। সুভদ্রা ঠাকুরাণীর রথ এই দুইখানি রথ অপেক্ষা উচ্চতায় ও আয়তনে ছোট। জগন্নাথের রথখানি এত বড় যে, উহার মধ্যে ন্যূনাধিক দুই শত লোকের স্থান সঙ্কুলান হয় এবং পাণ্ডাগণ ও তাহাদের অনুচরবর্গ রথে চড়িয়াই ঠাকুরের সহিত গুণ্ডিচা-বাটীতে গমন করে। জগন্নাথের রথে ১৬ খানি, বলরামের রথে ১৪ খানি এবং
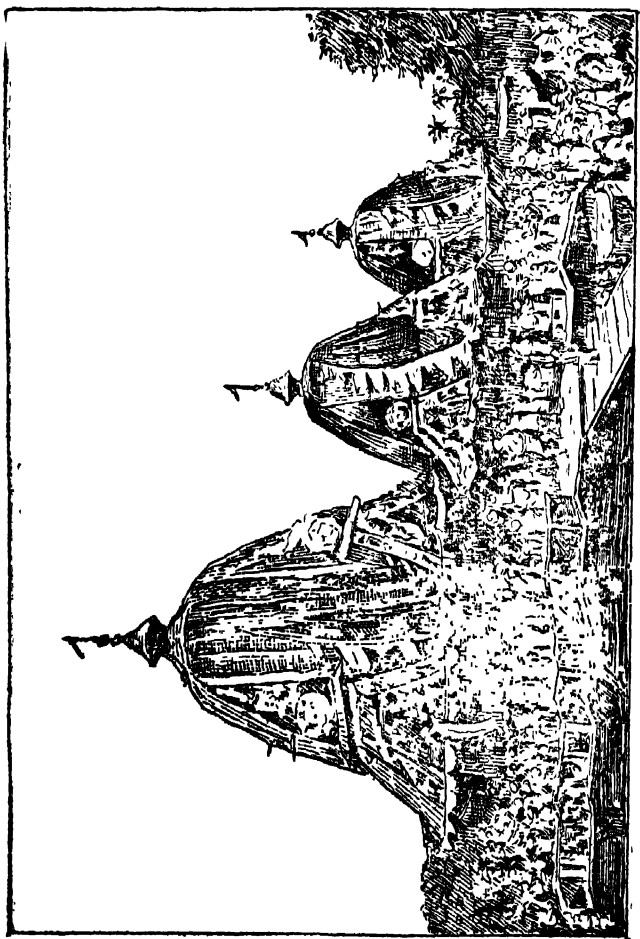
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।

সুভদ্রার রথে ১২ খানি খোদাই করা বৃহদাকারের কাষ্ঠনির্ম্মিত চাকা সংযুক্ত থাকে। জগন্নাথের রথের নাম গরুড়ধ্বজ এবং বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর রথ যথাক্রমে তালধ্বজ ও পদ্মধ্বজ নামে পরিচিত।

রথ টানিবার জন্য এক দল লোক নিযুক্ত থাকিলেও অধিকাংশ সময়ে রথ-টানা-কার্য্য যাত্রীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। একক্রোশ-ব্যাপী রাজপথে সমবেত জনতা, দলের পর দল, কাছিতে হাত লাগাইয়া রথগুলিকে ধীরে ধীরে শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচা-বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। বলরামের রথ সর্ব্বপ্রথমে, তৎপরে সুভদ্রা দেবীর এবং সর্ব্বপশ্চাদ্ভাগে জগন্নাথের রথ অবস্থিত থাকে।

রথ চলিবার পূর্ব্বে জগন্নাথ দেবের প্রধান সেবক পুরীর রাজা মণি-মুক্তাখচিত স্বর্ণনির্ম্মিত একটি সমার্জ্জনী হস্তে লইয়া রথের সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। তৎপরে "জয় জগন্নাথ" ধ্বনিতে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া যাত্রিগণ পরে পরে অবস্থিত তিনখানি রথের কাছি ধরিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হয়। রথগুলি অত্যন্ত ভারী, এত লোকের টানেও সহজে সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে চাহে না। যাহা হউক, এইরূপ টানাটানি করিয়া ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে জগন্নাথের রথ তাঁহার মাসীর বাড়ীর (গুণ্ডিচা-বাড়ী) সিংহদ্বারে উপনীত হয়। কখন কখন রথ পৌঁছিতে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী দেরী হয়—এমন কি, সময়ে সময়ে রথগুলি সেখানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া যায়।

ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল। রথযাত্রা উপলক্ষে এ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। ইহা কবিতার আকারে সুকুমারমতি বালক-বালিকাগণের পাঠ্য পুস্তকেও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গল্পটি এই :—

বৃদ্ধা ও পঙ্গু এক দরিদ্র চণ্ডালরমণী রথে বামনমূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুলপ্রাণে অতি কষ্টে কোনমতে শ্রীক্ষেত্রের হাটা পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। তাহার গৃহ হইতে পুরুষোত্তম প্রায় শত ক্রোশ ব্যবধান। রথের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই সে এই দীর্ঘ পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। রথের যখন সবেমাত্র দুই দিন বাকী আছে, সে তখন কোনমতে কটক পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বৃদ্ধা সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, শ্রীক্ষেত্র আর কতদূর এবং রথের আর কয় দিন বাকী আছে। কটকের কোন লোক তাহাকে সংবাদ দিল যে তৎপরদিনই রথযাত্রা, সুতরাং তাহার ভাগ্যে সে বৎসর রথ দেখা ঘটিবে না। বৃদ্ধা কিন্তু সে কথা কোনমতে বিশ্বাস করিল না। সে বলিল যে, রথে উপবিষ্ট ভগবানের শ্রীমুখ একবারমাত্র দেখিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য সে বহুকষ্টে বহুদূর হইতে আসিতেছে। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার বাসনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, না করিলে তাঁহার পতিত পাবন নামে কলঙ্ক হইবে। বহুদূর হাঁটিয়া সে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়াছিল, তথাপি হৃদয়ে এই মধুর আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিয়া সে অতি ধীরে ধীরে পুনরায় পুরীর পথে অগ্রসর হইল।

এ দিকে রথযাত্রার দিন ঠাকুরকে মহা আড়ম্বরের সহিত রথের উপর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ যাত্রী রথের কাছি ধরিয়া রথ টানিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু প্রভুর রথ এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। অবশেষে মানুষ ছাড়িয়া রথে বিস্তর হাতী যুড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ভগবান্ আজ তাঁহার মধুর লীলা দেখাইবার জন্য বিশ্বম্ভরমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, হাতীর সাধ্য কি যে, রথ লইয়া এক পদও অগ্রসর হয়? পাণ্ডাগণ ব্যাকুল হইয়া অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য জগন্নাথের স্তব-স্তুতি করিতে আরম্ভ করিল এবং পথে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার কৃপাভিক্ষা

করিতে লাগিল। তখন দৈববাণী হইল যে, এক জন প্রকৃত ভক্ত তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। সে না পৌঁছিলে এবং রথের কাছি না ধরিলে রথ চলিবে না, অতএব শীঘ্র তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হউক। এইরূপ দৈবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডাগণ চতুর্দ্দিকে সেই প্রকৃত ভক্তের অনুসন্ধানে ধাবমান হইল। কত সাধু-সন্ন্যাসী, কত বৈষ্ণব-বৈরাগী, কত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে অনুসন্ধান করিয়া রথের নিকটে লইয়া আসিল। তাহারা জনে জনে এবং সকলে একত্রে সমবেত হইয়া রথের কাছি ধরিয়া কত টানাটানি করিল কিন্তু রথ কিছুতেই অগ্রসর হইল না। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রধান পাণ্ডা দেখিতে পাইলেন যে, বহুদূরে পুরীর পথে এক বৃদ্ধা, খঞ্জ, প্রায় চলচ্ছক্তিহীনা, নীচজাতীয়া দুঃখিনী রমণী অতি কষ্টে ধীরে ধীরে পুরীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে ভিখারিণী মনে করিয়া প্রধান পাণ্ডা কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে চাহিলেন এবং সেই মধ্যাহ্নসময়ে প্রচণ্ড রৌদ্রে পথ চলিতে নিষেধ করিলেন। সেই রমণী ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিল যে, সে রথোপবিষ্ট দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য প্রায় শত ক্রোশ পথ কয় মাস ব্যাপিয়া কোনমতে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ঠাকুরের শ্রীমুখদর্শন ভিন্ন সে অন্য ভিক্ষার প্রার্থী নহে। যেমন করিয়া হউক, সে রথোপবিষ্ট তাহার আরাধ্য ইষ্টদেবতার শ্রীমুখপঙ্কজ দেখিবেই দেখিবে। পাণ্ডা বৃদ্ধার ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং এই লোকই ঠাকুরের প্রকৃত ভক্ত, ইহা স্থির করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই জীর্ণবাসা, মলিনদেহা, পঙ্গু, বৃদ্ধা রমণীকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া পুরীর পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধা তখন "আমি অস্পৃশ্যা চণ্ডালরমণী, আমাকে স্পর্শ করিলে তুমি পতিত হইবে, অতএব তুমি আমাকে ত্যাগ কর" ইত্যাদি বহু কাতরোক্তি করিলেও পাণ্ডা

তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন যে, নীচ জাতীয়া হইলেও ভক্তির গুণে বৃদ্ধা তাঁহার পরম গুরু, তাহাকে স্পর্শ করিয়া তিনি আজ ধন্য হইয়াছেন।

কতক্ষণ পরে প্রধান পাণ্ডা বৃদ্ধাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রথের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা সাশ্রুনয়নে ভগবানের শ্রীমুখের উপর নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে ঠাকুরকে প্রণিপাত করিল এবং প্রধান পাণ্ডার সবিনয় নির্ব্বন্ধে রথের কাছি স্পর্শ করিবামাত্র অচল রথ তখনই সচল হইল। বৃদ্ধার আগমন প্রতীক্ষায় জগন্নাথ দেব এতক্ষণ নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিলেন; ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া তিনি নিজের "ভক্তবৎসল" নাম এইরূপে সার্থক করিলেন।

ভক্ত বিশ্বাসিগণ এই গল্পের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া আনন্দ অনুভব করিবেন, এই উদ্দেশ্যে ইহা এই স্থলে বর্ণিত হইল। "আষাঢ়ে গল্প" মনে করিয়া পাঠে যদি কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, তাহা হইলে তিনি যেন নিজগুণে প্রাচীনভাবাপন্ন লেখকের বয়োধর্ম্মসুলভ দৌর্ব্বল্য মার্জ্জনা করেন।

গুণ্ডিচা বাড়ীকে "গুঞ্জা বাড়ী" বা জগন্নাথের মাসীর বাড়ী কহে। ইহা একটী উদ্যান-পরিবেষ্টিত মন্দির। প্রবাদ এই যে গুণ্ডিচা দেবী রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পাটরাণী ছিলেন এবং এই স্থানে রাজা সস্ত্রীক অশ্বমেধযজ্ঞ সমাধা করেন। তাঁহারই নামে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে যে ভগবানের দারুমূর্ত্তি এই স্থানে বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক গঠিত হইয়াছিল। সহরের যে স্থানে ইহা অবস্থিত, তাহার নাম জনকপুর। ঠাকুরেরা সাত দিন মাসীর বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আদর-আপ্যায়ন ও অতিথি-সৎকারে তৃপ্ত হইয়া দশমী তিথিতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইহারই নাম "পুনর্যাত্রা" বা "উল্টারথ"। এই স্থানে মন্দিরের অভ্যন্তরে "গুণ্ডিচা দেবীর" একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

গুণ্ডিচা বাড়ী বা জগন্নাথের মাসীর বাড়ী।

এই কয় দিন গুণ্ডিচা বাড়ীতে মহাড়ম্বরের সহিত রথোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। গুণ্ডিচা বাড়ী সমস্ত বৎসর খালি পড়িয়া থাকে। রথের সময়ে উহাকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া দেবতাদিগের বাসের উপযুক্ত করিয়া লওয়া হয়। পুরীর রাজা স্বয়ং এবং পুরীর অধিবাসী ও যাত্রিগণ অনেকে রথের পূর্ব্বদিন গুণ্ডিচা বাড়ীতে আগমনপূর্ব্বক মন্দির প্রকাশ্যভাবে পরিষ্কার করেন। এই শুদ্ধিকার্য্য "গুণ্ডিচা-মার্জ্জন" নামে অভিহিত। শ্রীচৈতন্যদেব যখন পুরী গমন করেন, তখন তিনি স্বহস্তে এই কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণিত আছে :—

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।

"গুণ্ডিচা মন্দির গেলা করিতে মার্জ্জন।
প্রথমে মার্জ্জনী লয়া করিলা শোধন॥
ভিতর মন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল।
সিংহাসন মাজি চারিভিত শোধিল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন।
ঊর্দ্ধ অধঃ ভিত গৃহমধ্য সিংহাসন॥"

সাত দিন এই স্থানে ঠাকুরদিগের দৈনিক সেবা, ভোগ, পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের ন্যায় গুণ্ডিচা বাড়ীতেও ঠাকুরের সুবৃহৎ মন্দির স্থাপিত আছে এবং এই মন্দিরও শ্রীমন্দিরের ন্যায় মূল-মন্দির, জগমোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ নামে চারিটি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত। মন্দির ও তৎসংলগ্ন বিবিধ তরুরাজিশোভিত উদ্যানবাটিকা এবং প্রকাণ্ড অঙ্গন, চতুর্দ্দিকে ফটকসমন্বিত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গুণ্ডিচা বাড়ীর প্রবেশ দ্বারের শীর্ষদেশে নবগ্রহ-মূর্ত্তি কৃষ্ণ প্রস্তরে সুন্দরভাবে খোদাই করা আছে। প্রাচীরের গাত্রে ক্ষোদিত বিবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও বিচিত্র পৌরাণিক দৃশ্যাবলী শোভা পাইতেছে। স্থানটি নির্জ্জন ও অতি মনোরম। তবে সমস্ত বৎসর অযত্নে পড়িয়া থাকে বলিয়া অন্য সময়ে ইহা ধূলা, আবর্জ্জনা, আগাছা, চামচিকা ও কীট পতঙ্গাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। ইহার বহির্ভাগে নৃসিংহদেব প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

রথ পৌঁছিবার তিন দিন পরে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বাহকের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা বাড়ীর বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসা হয় নাই, এই অভিমানে গুণ্ডিচা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া দ্বারদেশে অবস্থিত জগন্নাথের রথের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাগমন করেন।

দশমীর দিন তিন ঠাকুর ও ঠাকুরাণী পুনরায় রথে চড়িয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া আইসেন। ইতঃপূর্ব্বেই বহু যাত্রী পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং সে দিন রথ টানিবার লোক পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে অল্পসংখ্যক লোক উপস্থিত থাকে, তাহারা এবং কতকগুলি বেতনভোগী লোক রথগুলিকে টানিয়া শ্রীমন্দিরে পৌঁছাইয়া দেয়।

পুনর্যাত্রা।

জগন্নাথদেব ফিরিয়া আসিলেন বটে কিন্তু তখনও লক্ষ্মীঠাকুরাণীর অভিমান প্রশমিত হয় নাই। তাঁহার আদেশে ঠাকুর আসিবার পূর্ব্বে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। যাহা হউক, অনেক সাধ্য-সাধনার পর মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হয় এবং ঠাকুরেরা মন্দিরে পুনঃ প্রবেশ করেন।

এইরূপে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে পুরীর প্রধান উৎসব "রথযাত্রা" সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শ্রাবণ মাসের উৎসব "ঝুলন-যাত্রা।" শুক্লা নবমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সময়ে মন্দিরমধ্যে নিত্য পূজা, এবং ভোগাদি নৃত্যগীতের সহিত মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ঝুলন যাত্রা।

ভাদ্র মাসে "জন্ম-যাত্রা" বা জন্মাষ্টমী উৎসব। কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হইতে সাত দিন ঠাকুরকে "গোপাল-বেশ", "রাখাল-বেশ", "বন-বেশ" প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্রবেশে সজ্জিত করিয়া গোকুলে সখাসঙ্গে কৃষ্ণের গোচারণ-লীলার ভাব ভক্তগণের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়া হয়। পূতনা-বধ, গোবর্দ্ধন-ধারণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ বাল্যলীলার অভিনয় "যাত্রার" আকারে এই কয় দিন প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

জন্ম-যাত্রা।

আশ্বিন মাসের উৎসবের নাম "বিজয়-যাত্রা" বা "দুর্গামাধব-যাত্রা।" পুরীতে ইহা বাঙ্গালার শারদীয়া মহাপূজার সমকালিক শক্তিপূজা। এই উৎসব উপলক্ষে ষোল দিন ব্যাপিয়া মহা-ডম্বরের সহিত "বিমলা" দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

দুর্গামাধব যাত্রা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরী পুরাণোক্ত বাহান্ন পীঠের অন্যতম। এই স্থানে দেবীর নাভিদেশ পতিত হইয়াছিল। দেবীপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিমলা দেবীর মন্দিরের সম্মুখে ছাগ বা মেষ বলি প্রদান করা হয়। জগন্নাথের মন্দিরে বলিদান নিষিদ্ধ অথচ বিমলা শক্তির মূর্ত্তি বলিয়া বলিদান ব্যতীত তাঁহার পূজা সম্পন্ন হইলে উহা অঙ্গহীন হয়। এই দুই বিরোধী ব্যাপারের সামঞ্জস্যহেতু ভক্তেরা মনে করিয়া লয়েন যে, এই তিন দিন জগন্নাথদেব ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকেন, সুতরাং বলিদানের সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছায় না। এই তিন দিন বিমলা দেবীকে মৎস্যভোগ নিবেদন করা হয়।

কার্ত্তিক মাসের প্রথম উৎসবটি বাৎসল্য রসের পরিচায়ক। এই সময়ে ঠাকুর, মাতা যশোদার নিকট অবস্থান করেন এবং বিবিধ প্রকারের বাল্যভোগ সেবারূপে গ্রহণ করিয়া জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করেন। যদি রাসপূর্ণিমা এই মাসে পড়ে, তাহা হইলে ধুমধামের সহিত এই মাসেই রাসলীলা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকোৎসব।

কার্ত্তিক মাসে রাস না হইলে অগ্রহায়ণ মাসে উহা আড়ম্বরের সহিত নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই এই মাসের প্রধান উৎসব।

রাসলীলা।

কার্ত্তিক মাসের উৎসবে যেমন যশোদার অধিকার, পৌষের উৎসবে সেইরূপ লক্ষ্মীঠাকুরাণীর একাধিপত্য। এই মাসে ঠাকুর

পৌষের উৎসব।

লক্ষ্মীদেবীর আদরআপ্যায়ন উপভোগ করিয়া থাকেন। প্রভাতসময়ে বেলা সাতটার মধ্যে ঠাকুরের "পহলীভোগ" সম্পন্ন হইয়া রাত্রিতে তিনি "বরশৃঙ্গার বেশ" ধারণ করিয়া দেব-দাসীগণ কর্তৃক গীত শ্রীজয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করেন।

মাঘমাসে ঠাকুরের "পদ্মবেশ।" শ্রীপঞ্চমীর দিনে বিগ্রহত্রয়কে অসংখ্য পদ্মফুল দিয়া সুন্দররূপে সাজান হইয়া থাকে। মাঘী পূর্ণিমার দিন ঠাকুর "গজোদ্ধারণ-বেশ" ধারণ করেন। স্বর্ণ, মণি, মুক্তা ও হীরকখচিত বিবিধ বিচিত্র অলঙ্কার পরাইয়া জগন্নাথদেবকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী মোহনবেশে সজ্জিত করা হয়। এই বেশের আর একটি নাম "আর্ত্তত্রাণ বেশ।" ইহা দর্শন করিবার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বিস্তর যাত্রীর সমাবেশ হইয়া থাকে। সেই সময়ে পুরীর উৎসব দর্শনীয় এবং উপভোগ্য।

পদ্ম-বেশ ও গজো-দ্ধারণ-বেশ।

"ফাল্গুন মাসে দোল-যাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি।" এই মাসে দোলপূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুরের প্রতিনিধি "মদনমোহন"কে শ্রীমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত উচ্চ দোলমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দোল দেওয়া হয় এবং ঠাকুরের সহিত আবির খেলার ধূম পড়িয়া যায়। এই উৎসবোপলক্ষে বাঙ্গালী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী যাত্রীর সংখ্যা অধিক হইয়া থাকে।

দোল-যাত্রা।

চৈত্র মাসে "রামনবমী" উপলক্ষে বিমলা দেবীর পূজা হয়। ইহা শক্তিপূজা এবং আমাদের দেশের বাসন্তীপূজার অনুরূপ। বাঙ্গালার শক্তিপূজার বৈশিষ্ট্য এই অনুষ্ঠানে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামনবমী-যাত্রা।

উপরিউক্ত প্রধান উৎসবগুলি ব্যতীত প্রতি মাসেই দুই একটী ক্ষুদ্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক্ষণে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি যে বলিয়াছিলাম যে পুরীতে পার্ব্বণের সংখ্যা বার মাসে ১৩র অধিক, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।
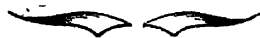
পুরীতে বিভিন্ন হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিস্তর মঠ অবস্থিত রহিয়াছে। অধিকাংশ মঠভবনই অতি সুপ্রশস্ত, বহু গৃহ ও চত্বর-সমন্বিত এবং বহু লোকের বাসের উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত। কয়েকটী প্রধান মঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

পুরীর মঠ।

অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মঠের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মঠই প্রাচীন ও উল্লেখযোগ্য। ইহার অপর নাম "গোবর্দ্ধন মঠ।" এইরূপ কথিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য স্বয়ং এই মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মঠে তাঁহার এক অতি সুন্দর শ্বেতমর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত, প্রতিভা ও তেজোমণ্ডিত, আসনপরিগ্রাহী সৌম্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শ্রীমন্দির হইতে স্বর্গদ্বারের পথ সমুদ্র-উপকূলে যে স্থলে মিলিত হইয়াছে, সেই অতি মনোহর নির্জ্জন প্রদেশে এই মঠ প্রতিষ্ঠিত। বাহির হইতে মঠের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না। ভিতরে প্রবেশ করিবার সময়ে মঠটি অত্যুচ্চ বালুকাস্তূপের মধ্যে প্রোথিত বলিয়া মনে হয়। এই মঠের অধিস্বামী একজন সন্ন্যাসী। আমি যখন মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী এই মঠের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি তখন প্রায় বিশ বৎসর এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি মিরাট প্রদেশবাসী, তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। তিনি এক জন সুপণ্ডিত ও জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ও সদালাপী। গতবৎসর হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকিল

শঙ্করাচার্য্যের মঠ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এই মঠের অধিকারীর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখিয়াছি। মঠের মধ্যে একটী পুস্তকাগার দেখিলাম, তন্মধ্যে অনেক প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দেখিলাম প্রায় ২০ জন ছাত্র মঠে নিয়ত অধ্যয়নকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। ছাত্রদিগের মধ্যে উড়িষ্যাবাসীদিগের সংখ্যাই অধিক। বেদান্ত, দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এই মঠে যথারীতি অধীত হইয়া থাকে। ছাত্রদিগের যাবতীয় ব্যয়ভার মঠই বহন করিয়া থাকে। ভূসম্পত্তি হইতে খরচ-খরচা বাদ দিয়া মঠের আয় বাৎসরিক প্রায় দুই হাজার টাকা। এই স্থানে "গোপালের" একটী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাতঃকালে "গোপাল"কে যে অন্নভোগ দেওয়া হয়, ছাত্র-মণ্ডলী ও অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবার জন্য তাহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মঠ হইতে প্রতিদিন চাউল, দাল, তরকারী প্রভৃতি খাদ্যসামগ্রী কাঁচা অবস্থায় জগন্নাথের ভোগের জন্য শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহার পরিবর্ত্তে মঠে শ্রীমন্দির হইতে অপরাহ্ণে জগন্নাথের অন্নভোগ প্রেরিত হয় এবং তাহার দ্বারাই মঠাধিবাসি-গণের রাত্রির সেবা সম্পন্ন হইয়া থাকে। শিক্ষার জন্য ছাত্রদিগের নিকট হইতে কিছু লওয়া হয় না। এই মঠে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের ছাত্র গৃহীত হয় না।

চৈতন্য মঠ এবং পশ্চাদ্বর্ণিত অপর দুই একটী মঠ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইহাদিগের মোহান্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব। গম্ভীরা মঠ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক উড়িষ্যাবাসী ভক্ত রাধাকান্ত মিশ্রের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা

গম্ভীরা, চৈতন্য বা রাধাকান্ত মঠ।

"সিদ্ধ বকুলের" সন্নিকটে অবস্থিত। চৈতন্যদেব পুরীতে আগমন করিয়া এই স্থানেই অবস্থিতি এবং অষ্টপ্রহর সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার কন্থা, কাষ্ঠপাদুকা ও কমণ্ডলু অতি যত্নের সহিত এই মঠে সংরক্ষিত হইয়াছে। এই মঠে একটী "গোপাল-বিগ্রহ" প্রতিষ্ঠিত আছে। মহাপ্রভুর লীলা ও সংকীর্ত্তনের কতিপয় তৈলচিত্র এই মঠস্থিত গৃহগুলির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

টোটা গোপীনাথের মঠ।

ইহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঠ। পশ্চাদ্বর্ণিত "হরিদাসের মঠ" এই মঠের অধীন। এই মঠে "গোপীনাথের" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে একগাছি স্বর্ণ-নির্ম্মিত বলয় সংলগ্ন আছে। প্রবাদ এই যে, চৈতন্যদেব দেবদেহের এই বলয়-চিহ্নিত স্থানে সশরীরে প্রবেশ করিয়া তিরোভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অপর মতে তিনি ভাবাবেশে মহোদধির নীলাম্বুরাশির মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন। ভিন্ন মতে সংকীর্ত্তনের সময়ে তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল। তাহার ফলে দুষ্ট ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং উহাই অবশেষে তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। স্বর্গীয় রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুর এই মঠের সেবার জন্য নিজ হইতে বাৎসরিক প্রায় ৮০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

হরিদাসের মঠ।

হরিদাসের মঠ একটি সমাধি। ইহা সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী 'স্বর্গদ্বারের' নিকট অবস্থিত। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বিশেষ শ্রদ্ধার স্থান। এই স্থানে হরিভক্তচূড়ামণি যবন হরিদাসের নশ্বর দেহ মহাপ্রভু স্বয়ং সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। এই মঠের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রতিদিন এই সকল মূর্ত্তির যথারীতি পূজা,

ভোগ ও আরতি হইয়া থাকে এবং সেই ভোগ দ্বারা সাধু-বৈষ্ণবগণের সেবা সম্পন্ন হয়।

রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়শিষ্য, রামানন্দ রায় এই মঠ স্থাপন করেন। যখন মহাপ্রভু নীলাচলে বাস করিতেছিলেন, তখন রামানন্দ এই স্থানে বাস করিয়া প্রভুর সহিত সর্ব্বদা মিলিত হইতেন।

জগন্নাথবল্লভ মঠ।

কথিত আছে যে, রামানন্দই শ্রীমন্দিরের মধ্যে দেব-দাসী কর্ত্তৃক নৃত্য-গীতের প্রবর্ত্তন করেন। এই মঠের বাৎসরিক আয় প্রায় ১৫ হাজার টাকা। এই মঠ পরিচালনের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত আছে। ইহা জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-সম্পত্তিভুক্ত। এই মঠের অধিবাসিগণের জন্য প্রত্যহ শ্রীমন্দির হইতে ভোগ প্রেরিত হয়। এই মঠ-সংলগ্ন উদ্যানে মহাপ্রভু ভক্তসঙ্গে সর্ব্বদা বিহার করিতেন।

রামানুজ-সম্প্রদায়ের মঠগুলির মধ্যে এমার মঠ ও রামদাসের মঠ, এই দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এমার মঠ শ্রীমন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত। পুরীর যাবতীয় মঠের মধ্যে এই মঠই ঐশ্বর্য্যে ও প্রতিপত্তিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মঠে বিবিধ আহার্য্য সামগ্রী এত প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত থাকে যে, পুরীতে

এমার মঠ।

বর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও ইহার মধ্যে সঞ্চিত খাদ্য হইতে প্রত্যেক অধিবাসীর অন্নের ব্যবস্থা হইতে পারে। আমি যখন পুরীতে গমন করিয়াছিলাম, তখন এই মঠের মোহান্ত আত্মীয়-স্বজনবর্গের সহিত এই স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। মঠের মোহান্তগণের উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নিষিদ্ধ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিষয়সুখভোগে বঞ্চিত থাকেন না। তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের

নিকট-আত্মীয় কোন ব্যক্তি তাঁহাদের গদি অধিকার করিয়া থাকেন। এই মঠে টাকা ধার দিবারও ব্যবস্থা আছে। শুনিলাম, প্রতি টাকায় এক আনা সুদে টাকা ধার দেওয়া হয় এবং আদায় সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত। মঠের সম্পত্তির আয় বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকা। মঠে প্রত্যহ প্রায় এক শত দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইয়া থাকে। এতদুপলক্ষে প্রাতঃকালে এই মঠের মধ্যে যাবতীয় আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; বৈকালে শ্রীমন্দির হইতে ভোগ আসিবার ব্যবস্থা আছে। মঠে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা আছে। তথায় এক জন পণ্ডিত এবং তাঁহার কয়েকজন ছাত্রকে অবস্থান করিতে দেখিলাম। অবশ্য তাঁহাদের যাবতীয় খরচ মঠের আয় হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। মঠের মধ্যে একটী সুন্দর পাঠাগার আছে। মোহান্তের সাজসজ্জা দেখিয়া তাঁহাকে বিষয়ী লোক বলিয়াই মনে হইল। মঠের মধ্যে ভোগবিলাসের উপকরণ যে নাই, এমন মনে করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। মঠের গদি তাঁহারই সম্পর্কীয় লোকের অধিকারভুক্ত।

ইহাও রামানুজ-সম্প্রদায়ের অধীন একটী সুবৃহৎ মঠ। এই মঠের তদানীন্তন মোহান্তের সহিত আলাপ করিয়া সাতিশয় সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার বয়স চল্লিশের অধিক নহে। তিনি অতি সজ্জন, পণ্ডিত ও সদালাপী। এই মঠের মধ্যে দশ অবতারের বৃহৎ চিত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিলাম। চিত্রগুলি দর্শনীয় এবং মনের মধ্যে বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার করে। এই চিত্রে নবম অবতার বুদ্ধদেব জগন্নাথরূপে চিত্রিত হইয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে, দশাবতারের চিত্রে জগন্নাথদেবকে হস্তপদবিশিষ্ট করা হইয়াছে।

শ্যামদাসের মঠ।

গীতায় বর্ণিত ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি এই মঠের একটি গৃহের প্রাচীরে চিত্রিত থাকিতে দেখিলাম। এই বিরাটমূর্ত্তির বহুসংখ্যক মস্তক এবং ঐগুলি বিবিধপ্রাণীর মস্তকরূপে দর্শিত হইয়াছে।. ইহাদিগের মধ্যস্থলে একটি সিংহের বৃহৎ মুণ্ড অবস্থিত এবং দুই পার্শ্বে ব্যাঘ্র, বরাহ, ঘোটক, মহাবীর (হনুমান) প্রভৃতি নানাজাতীয় প্রাণীর মুণ্ড বিরাজ করিতেছে। তদুপরি মনুষ্য, বানর, পক্ষী প্রভৃতি অপরাপর বিবিধ প্রাণীর মস্তক বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত হইয়া বিরাটমূর্ত্তির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বিরাট পুরুষের নাভিকূপে ব্রহ্মা এবং তদূর্দ্ধে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। চিত্রে কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত অর্জ্জুনের রথ এবং তৎসন্নিকটে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। জিজ্ঞাসায় অবগত হইলাম যে, একটি মূর্ত্তি রামানুজের এবং অপরটি তাঁহার এক জন ভাষ্যকারের। অনেক অনুমান করেন যে, এই দুইটি মূর্ত্তি রামানুজের কোন শিষ্য দ্বারা চিত্রমধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই বহুহস্তবিশিষ্ট এবং হস্তসমূহে বিবিধ সামগ্রী ধৃত।

এখানে পঞ্চমুণ্ড এবং দশহস্তবিশিষ্ট এক নূতন গণেশ-মূর্ত্তির চিত্র দেখিলাম। ইহা ব্যতীত একশীর্ষ ও দুই হস্ত বিশিষ্ট সাধারণ গণেশের মূর্ত্তি'ও চিত্র বিস্তর রহিয়াছে।

দক্ষিণপার্শ্ব ও উত্তরপার্শ্ব শ্রীরাম মঠ।

এই দুইটি মঠের ব্যবস্থা এমার মঠের ন্যায়, তবে পরিসরে ও ঐশ্বর্য্যে উহা অপেক্ষা ছোট। দক্ষিণপার্শ্ব শ্রীরাম মঠের বাৎসরিক আয় ৮০ হাজার টাকা।

উপরিউক্ত কয়েকটি মঠ ব্যতীত "গঙ্গামাতার মঠ", "বেঙ্কটাচার্য্য মঠ" প্রভৃতি আরও কয়েকটি মঠ রামানুজসম্প্রদায়ের অধীন।

"জটে বাবাজীর" মঠ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পরম ভক্ত স্বনামপ্রসিদ্ধ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধিমন্দির। নরেন্দ্র সরোবরের উত্তরতীরে ইহা

অবস্থিত। গোস্বামী মহাশয় অদ্বৈতাচার্য্যবংশের সন্তান। তিনি যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং প্রচারকরূপে একনিষ্ঠভাবে বহুদিন ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছিলেন। পরমহংস-দেবের সহিত সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুলধর্ম্ম পুনরায় গ্রহণ করেন এবং বহুশিষ্যসমন্বিত হইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তপ, জপ, আরাধনা ও হরিনামকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তিনি শিষ্যপরিবৃত হইয়া বহুদিন পুরীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার মস্তক জটাবৃত এবং মুখমণ্ডল ঘনদীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রুতে আবৃত ছিল। এই জন্য তিনি পুরীর লোকের নিকট 'জটে বাবাজী' বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি পুরীতেই ১৩০৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং ঐ বৎসরেই তাঁহার পুত্র পরলোকগত যোগজীবন গোস্বামী কর্ত্তৃক নরেন্দ্র সরোবরের তীরে এই সমাধি স্থাপিত হয়। যোগজীবন পিতৃ আজ্ঞানুসারে দেহ দাহ না করিয়া এই স্থানে সমাধিস্থ করেন। ক্রমে উহার চতুষ্পার্শ্বের জমী ক্রয় করিয়া এই মঠ প্রস্তুত হইয়াছে। এই মঠের ভূমির পরিমাণ প্রায় তিন একার্ (Acre)। প্রথমতঃ এই জমীর উপর কয়েকখানি খড়ের চালের ঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে কলিকাতার ধাত্রী শ্রীমতী বদনমণির অর্থ-সাহায্যে টালির ঘর প্রস্তুত করা হয়। যোগজীবন গোস্বামীর দেহরক্ষার পর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয়ের বদান্যতায় বর্ত্তমান সৌষ্ঠবসম্পন্ন পাকা মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি বা "জটে বাবাজীর" মঠ।

বর্ত্তমান মন্দিরটী পঞ্চচূড়াসম্পন্ন। ইহার সম্মুখস্থ ও সংলগ্ন জগমোহন (দালান) প্রশস্ত ও মর্ম্মরপ্রস্তরখচিত। মন্দিরাভ্যন্তরে বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী মহাশয়ের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পাণ্ডাগণ গোস্বামী মহাশয়কে জগন্নাথ দেবের একটি কুণ্ডল প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও বাঁধাইয়া এই মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। সমাধি-পীঠ তাঁহার নামাবলী দ্বারা আচ্ছাদিত এবং এই স্থানে নিত্য পূজা, আরতি ও ভোগ যথারীতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভোগের প্রসাদ অতিথি, অভ্যাগত ও শিষ্যবর্গের মধ্যে বিতরিত হইয়া থাকে। মন্দিরটি চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং ইহার তিনটি ফটক আছে। মঠ-সংলগ্ন উদ্যানে ফুল ও বিবিধ ফলের গাছ ব্যতীত চারিটি ভূর্জ্জপত্রের গাছ আছে। শ্রীব্রজেন্দ্র দাস মঠের মধ্যে একটি কূপ খনন করাইয়া দিয়াছেন; ঐ কূপের জল এই স্থানে পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের পাঠ্যপুস্তক এবং তাঁহার বসনাদি সমস্তই অতি যত্নে এই মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছে। এই মঠের ভূতপূর্ব্ব সেবায়েত শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থসংগ্রহ দ্বারা মঠের যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় এই মঠে একটি লাইব্রেরী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর এই মঠে গোস্বামী মহাশয়ের তিরোভাব-তিথিতে মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রায় ২ সহস্র দরিদ্রনারায়ণ, ১৫ শত ব্রাহ্মণ ও ৩ শত ভক্ত স্ত্রী-পুরুষ ঐ দিবসে মঠে সেবা গ্রহণ করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বিদায় ও সাধু সন্ন্যাসিগণকে বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়। শ্রীকুলদা ব্রহ্মচারী এই মঠের বর্ত্তমান সেবায়েত। এই স্থানে তাঁহার একটি বাড়ী আছে, তাহাকে "ঠাকুরবাড়ী" বলে।

এই মঠ সাধন-ভজনের উপযুক্ত স্থান। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে এই মঠে যাইয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মসাধনা করিয়া থাকেন।

পুরী সহরে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আরো অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ আছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহাদের উল্লেখ করা গেল না।

দেবস্থান হিসাবে চক্রতীর্থ, সিদ্ধবকুল এবং বাট লোকনাথের মন্দির উল্লেখযোগ্য। চক্রতীর্থে একটি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর একখানি চক্র অবস্থিত। একটী প্রস্রবণ হইতে উত্থিত জলের মধ্যে চক্রখানি নিমজ্জিত। যাত্রিগণ এই জল ভক্তিসহকারে মস্তকে অর্পণ করে। প্রবাদ এই যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এই স্থানে দারুব্রহ্ম নির্ম্মাণের জন্য নিম্বকাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাত্রিগণ এই স্থানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে। ইহার সন্নিকটে চক্রনারায়ণ ও সোণার গৌরাঙ্গের মন্দির অবস্থিত।

অন্যান্য দেবস্থান।
চক্রতীর্থ।

স্বর্গদ্বারের পথে একটী অপ্রশস্ত গলির মধ্যে সিদ্ধবকুল নামে একটী ক্ষুদ্র তীর্থস্থান। এই স্থানে উক্ত নামধেয় বৃক্ষের তলদেশে উপবেশন করিয়া চৈতন্য দেবের প্রিয়শিষ্য সাধু হরিদাস ভজন সাধন করিতেন। বৃক্ষের গুঁড়ি ও শাখাপ্রশাখা সম্পূর্ণ ফোঁপরা। শুধু পুরু ত্বকের সাহায্যে বৃক্ষটী দাঁড়াইয়া ও বাঁচিয়া রহিয়াছে। পুরীতে এই ধরণের আরো অনেক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিদ্ধ বকুল।

স্বর্গদ্বারের পথে পুরী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে বাট লোকনাথের মন্দির। ইনি একটী শিবলিঙ্গ। ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত, সেইজন্য ইঁহার প্রতিনিধি মূর্ত্তিকে শ্রীমন্দিরের তোষাখানার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত প্রত্যহ তথায় লইয়া আসা হয়। ইঁহার বেদীর সন্নিকটে অবস্থিত একটী প্রস্রবণ হইতে নিয়ত জলধারা উত্থিত হইয়া লিঙ্গমূর্ত্তিকে জল-মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীমন্দির হইতে প্রায় দুই মাইল,

লোকনাথ।

পশ্চিমদিকে গমন করিলে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকাময় তটের উপর অবস্থিত লোকনাথের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। জনশ্রুতি এই যে লঙ্কাধিপতি রাবণ কর্ত্তৃক লোকনাথ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিবরাত্রির সময়ে এই স্থানে একটী মেলা বসে এবং বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

মার্কণ্ডেয় সরোবর।

মার্কণ্ডেয় সরোবর পুরীর পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী। ইহার তীরে একটী শিবমন্দির অবস্থিত। প্রবাদ এই যে মার্কণ্ডেয় মুনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই শিবমন্দির ব্যতীত সরোবরের সন্নিকটে গণেশ, যম এবং মাতৃকা-মূর্ত্তি সংস্থিত রহিয়াছে।

জগবন্ধু ও মহাপ্রভু।

(১)
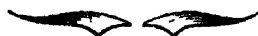
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব উড়িষ্যাবাসিদিগের নিকট "জগবন্ধু" নামে সাধারণ-ভাবে পরিচিত ও পূজিত। বাংলার ভক্তি-অবতার "মহাপ্রভু" শ্রীচৈতন্য দেব কিরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী গৌরভক্তদিগের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইল। চৈতন্য-চরিতামৃত, চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য-মঙ্গল, মুরারির গ্রন্থ, গোবিন্দদাসের কড়্চা প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহে মহাপ্রভুর উৎকল-লীলা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকার জন্য তাহার একটী সংক্ষিপ্ত সার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার রচিত "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য" নামক উপাদেয় গ্রন্থে সরস ভক্তিপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। এস্থলে উপরোক্ত মহাজনদিগের রচিত মধুচক্র হইতে একবিন্দু মাত্র মধু সংগ্রহ করিয়া পাঠক-পাঠিকাগণের ভক্তিরসাস্বাদনস্পৃহার যৎকিঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধনের প্রয়াস পাইয়াছি।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র বহুদিন হইতে ভারতীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান হইলেও একমাত্র মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই বঙ্গদেশে ইহার মাহাত্ম্য বিশদভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্য শ্রীমদ্ রামানুজ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে পুরী গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার একজন শিষ্য কর্ত্তৃক "এমার মঠ" স্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসর পরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সশিষ্যে পুরী দর্শন করেন এবং

তথায় কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়া তদীয় সাম্প্রদায়িক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পুরীগমনের পূর্ব্বে বিবিধ উৎসব উপলক্ষে বঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিতেন কিন্তু তৎকালে এরূপ ভক্ত যাত্রীদিগের সংখ্যা অধিক ছিল না এবং বাংলার জনসাধারণের মধ্যে পুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে দর্শন করিবার জন্য এখনকার মত ঐকান্তিক আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দৃষ্ট হইত না। বঙ্গের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর সমকালিক ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের যশ ভারতের সর্ব্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং উড়িষ্যার প্রবল প্রতাপান্বিত স্বাধীন হিন্দু রাজা প্রতাপরুদ্র তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সভাপণ্ডিত পদে বরণ করতঃ তাঁহাকে পুরীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর পুরী যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ স্থানে আত্মীয় স্বজন সহ বসবাস করিয়াছিলেন। বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম এবং উৎকলের মহাবীর্য্যবান রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার পর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র ভক্তির আধিক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে "সচল জগন্নাথ" আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা অবলম্বন করিয়া উৎকলবাসিগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম সবিশেষ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার সময় হইতে আজি পর্য্যন্ত উড়িষ্যার প্রায় প্রতিগৃহে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত গৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের মধ্যে এবং পুরীর অন্যান্য স্থানে ও কতিপয় মঠে গৌরাঙ্গদেবের দারুময় ও মৃণ্ময়মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ও সেবিত হইতে দেখা যায়। যখন মহাপ্রভু উৎকলে বাস করিতেছিলেন, তখন প্রতি বৎসর রথের সময়ে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য ও ভক্তগণ বঙ্গদেশ হইতে পুরীতে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন এবং

নানাবিধ উৎসব ও কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া উৎকলবাসিদিগের মধ্যে ভক্তিস্রোতের প্রবল প্রবাহ সঞ্চার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর অনেকানেক উৎকলবাসী মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং তাঁহার পার্শ্বদগণের মধ্যে কাহারো না কাহারো শিষ্য। এ সম্বন্ধে চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে যে—

"অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি জীবে শিখাইল ভক্তি॥"

কথিত আছে যে জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে পুরী আগমন করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তথায় গোবর্দ্ধন মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মঠের অধিনায়কগণের উপাধি "তীর্থস্বামী"। ঐ মঠ এখনও বর্ত্তমান, উহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের একটী অতি সুন্দর শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত থাকিয়া মঠের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। উড়িষ্যা সে সময়ে প্রবলভাবে বৌদ্ধপ্রভাব সম্পন্ন ছিল। শ্রীমদ্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধ বিজয়ের পর হইতে উৎকলে বৌদ্ধ প্রভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। মহাবীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কেশরী ও গঙ্গা বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উৎকলে শিব ও বিষ্ণুর আরাধনা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে (খৃষ্টাব্দ ১৪৮৬) দোল পূর্ণিমার রাত্রিতে নদীয়া নগরে আবির্ভূত হন এবং চব্বিশ বৎসর বয়সে কাটোয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক জগতের আপামর সাধারণ জীবকে হরিনামামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। তিন দিবস কাটোয়াতে অবস্থান করিবার পর তাঁহাকে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আশ্রমে ভুলাইয়া লইয়া আসা হয় এবং তথায় পরিজন,

আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া উৎসবানন্দে এক দিবস অতিবাহিত করেন। পরদিন নিত্যানন্দ, দামোদর, জগদানন্দ, মুকুন্দ এবং গোবিন্দের সমভিব্যাহারে শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনের জন্য হাঁটা পথে ব্যাকুল হৃদয়ে পুরী যাত্রা করেন। তখন বাংলার পাঠান শাসন-কর্ত্তৃগণের সহিত উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্যের ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছিল। উৎকল যাইবার পথ তখন নিতান্ত বিপদসঙ্কুল এবং দুই রাজ্যের মধ্যস্থিত সীমান্ত প্রদেশ পার হওয়া রাজাজ্ঞায় নিষিদ্ধ। কিন্তু ভগবদ্দর্শনের নিমিত্ত তাঁহার প্রাণে এতই ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল যে কোন বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা বা ভ্রুক্ষেপ করিবার অবসর ছিল না এবং তাঁহার সহচরগণও তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পথের সকল বিপদ ও ক্লেশ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মহাপ্রভুর সহগামী হইয়াছিলেন।

মহাপ্রভু অন্তরঙ্গগণ সমভিব্যাহারে ভাগিরথীর পূর্ব্বতীর অবলম্বন করিয়া ২৪ পরগণার অন্তর্গত, বাংলার তদানীন্তন নবাব হুসেন সাহার কর্ম্মচারী সুপ্রসিদ্ধ রামচন্দ্র খাঁর অধিকারভুক্ত, ছত্রভোগ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় অম্বুলিঙ্গ ঘাটে স্নান সমাপন করিয়া জলশায়ী অম্বুলিঙ্গ নামক মহাদেবের পূজা সমাপন করিলেন। সে সময়ে ভাগিরথীর স্রোত খিদিরপুরের উত্তর দিয়া কালীঘাট হইয়া জয়নগর মজিলপুর, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামকে পবিত্র ও শস্যশালিনী করিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইত। এখন ভাগিরথীর ঐ অংশ একেবারে মজিয়া গিয়াছে; স্থানে স্থানে জলশূন্য খাতগুলি "বসুর গঙ্গা", "ঘোষের গঙ্গা" নামে পরিচিত হইয়া গঙ্গার আদিম গমন-পথ সূচনা করিতেছে।

রামচন্দ্র খাঁ মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পারের নৌকার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মহাপ্রভু ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে গঙ্গা পার

হইয়া রণারে প্রয়াগ-ঘাটে অবতীর্ণ হইলেন। এই প্রয়াগ-ঘাট তখন উৎকল রাজ্যের সীমান্তর্গত ছিল। এখন যেমন স্থবর্ণরেখা উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, তখন তাহা ছিল না। তখন চব্বিশ পরগণার কিয়দংশ এবং মেদিনীপুর জিলার দক্ষিণাংশ উৎকল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহার অপর নাম "ওড্র দেশ' ছিল।

'কথিত আছে যে রাজা যুধিষ্ঠির অজ্ঞাত বাসের সময়ে প্রয়াগ-ঘাটে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। মহাপ্রভু এই ঘাটে স্নান করিয়া শিব-পূজা সমাপনান্তে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অতঃপর তিনি রূপনারায়ণ নদী (দেবনদ) নৌকাযোগে পার হইয়া তাম্রলিপ্ত (তমলুক) সহরে উপনীত হন। এই স্থানে নদী পার হইতে তাঁহার কিঞ্চিৎ অস্থবিধা হইয়াছিল। মূর্খ মাঝি পারের কড়ি না লইয়া সশিষ্য তাহাকে পার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। ভক্তেরা লিখিয়াছেন যে তিনি মাঝির নিকট তাঁহার অলৌকিক ভাবাদি প্রকাশ করেন। তদ্দর্শনে মাঝি ভয়ে, বিস্ময়ে ও ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া সশিষ্য তাঁহাকে পার করিয়া দেয়। মহাপ্রভু তত্রস্থ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া জিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমাদেবীর পূজা সমাপনান্তে দাঁতন নগরে উপস্থিত হইলেন। ইহা তমলুক যাইবার পথে অবস্থিত এবং জলেশ্বর হইতে প্রায় ১২ মাইল দূরে। অনেকে অনুমান করেন যে দাঁতনে এক সময়ে বুদ্ধদেবের একটী দন্ত রক্ষিত হইয়াছিল এবং এই কারণে এই নগর দন্তপুর নামে পরিচিত। ৩১০ খৃষ্টাব্দে ঐ দন্ত তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইয়া অর্ণবযানযোগে সিংহল দ্বীপে নীত হয়। দাঁতন এক্ষণে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একটী ষ্টেসন্। তথায় শ্যামলেশ্বর মহাদেবের পূজা সমাপন করিয়া মহাপ্রভু ক্রমে স্থবর্ণরেখার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্থবর্ণরেখায় স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি জলেশ্বর নগরে গমন

করিলেন। তথায় বিশ্বেশ্বর নামক মহাদেবকে দর্শন করিয়া এক রাত্রি অতিবাহিত করেন এবং পরদিন প্রত্যুষে জলেশ্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" দর্শন করিবার নিমিত্ত রেমুনায় উপনীত হইলেন। প্রবাদ এই যে এই স্থানের জাগ্রত দেবতা গোপীনাথ ভক্ত শ্রীমাধবপুরীর জন্য ক্ষীব-নৈবেদ্য হইতে এক হাঁড়ি ক্ষীর পাণ্ডাদিগের অজ্ঞাতসারে বস্ত্র মধ্যে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং গভীর রাত্রিতে পূজারীকে স্বপ্ন দিয়া তাঁহার দ্বারা নগরের প্রান্তদেশে হাটের মধ্যে অবস্থিত শ্রীমাধব পুরীর সেবার জন্য ঐ প্রসাদী ক্ষীর প্রেরণ করেন। শ্রীমাধবপুবী সন্ধ্যার পর আরতি দর্শন করিতে আসিয়া ভোগেব ক্ষীর দর্শন করেন এবং প্রসাদী ক্ষীর ভক্ষণ করিতে তাঁহার অভিলাষ জন্মে কিন্তু তিনি কাহাব নিকট সেই অভিলাস ব্যক্ত করেন নাই। উপরোক্ত উপায়ে ভক্তবৎসল ঠাকুব ভক্তেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং এইজন্য তিনি "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

ক্ষীরচোরা গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভূজ বংশীধারী গোপাল মূর্ত্তি। মহাপ্রভু গোপালমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া অনুচবগণের সহিত মহোল্লাসে সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। কথিত আছে সে এই উদ্দাম নৃত্যের সময়ে দেবমূর্ত্তির মস্তক হইতে মুকুট খসিয়া পড়ে এবং মহাপ্রভু তাহা সযত্নে ও ভক্তিভরে নিজ শিরোদেশে রক্ষা করিয়াছিলেন।

রেমুনা, বালেশ্বর সহর লইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে প্রায় এক পক্ষ ব্যাপী গোপীনাথের মেলা হইয়া থাকে।

রেমুনা ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু বালেশ্বর প্রভৃতি কতিপয় নগর অতিক্রম করতঃ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ যাজপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে :—

"কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌর সুন্দর।
আইলেন যাজপুরে ব্রাহ্মণ নগর॥"

যাজপুরে বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। যজ্ঞ সম্পাদনার্থে রাজা যযাতি কেশরী এই স্থানে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যখন চৈতন্য দেব যাজপুরে গমন করিয়াছিলেন, তখন মুসলমানের অত্যাচারে তাহার গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত হয় নাই, তখন তথাকার শিল্পকলা-সমন্বিত সহস্র মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীগণের ষোড়শোপচারে পূজা ও সেবার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক রাজা মুকুন্দদেবের পরাজয় ও নিধনের পর হইতেই যাজপুরের ধ্বংসের সূচনা হয়। ইহার পূর্ব্বে পাঠানগণ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হইলেও পরাক্রান্ত হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক উহারা পুনঃ পুনঃ বিতাড়িত হইয়াছিল। বাংলার পাঠান ভূপতি সুলেমান করাণীর প্রধান সেনাপতি বিধর্ম্মী কালাপাহাড়ের দ্বারাই যাজপুরের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। যাজপুরের ধর্ম্মগৌরবের কথা চৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"লক্ষ লক্ষ বৎসরেও নারি লইতে সব নাম।
যাজপুরে আছয়ে যতেক দেবস্থান॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস যাজপুর গ্রাম॥"

যাজপুরের ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অল্পবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে; এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মহাপ্রভু দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করিয়া যজ্ঞবরাহ-মূর্ত্তি দর্শন করিলেন এবং প্রেম ও ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া সহচরগণের সহিত বহুক্ষণ নৃত্যগীতে নিযুক্ত রহিলেন। অনন্তর সমস্ত যাজপুর প্রদক্ষিণ করিয়া শক্তিরূপিণী বিরজা দেবী দর্শনে গমন করিলেন। এই

বিরজাক্ষেত্র যাজপুরের প্রধান তীর্থ। তিনি বিরজা মূর্ত্তির নিকট সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া প্রেম ও ভক্তি প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া নাভিগয়ায় পিতৃকৃত্য সম্পাদন করতঃ সহচরগণের অজ্ঞাতসারে যাজপুরস্থিত যাবতীয় শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন।

যাজপুর পরিদর্শনের পর শ্রীচৈতন্যদেব উড়িষ্যার হিন্দুরাজবংশের রাজধানী কটকে আগমন করেন। তথায় মহানদীতে স্নান করিয়া প্রশস্ত রাজপথ দিয়া "সাক্ষীগোপাল" নামক গোপাল-মূর্ত্তি দর্শন করিতে গমন করেন। তখন "সাক্ষীগোপাল" কটকের সন্নিকটে অবস্থিত ছিলেন। পরে ঐ দেবমূর্ত্তি পুরীর সন্নিকটস্থ সত্যবাদী নামক স্থানে বর্ত্তমান দেবমন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাক্ষী-গোপালের বিষয় ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা গেল না।

সাক্ষীগোপালের পূজারাধনাদি সমাপন করিয়া মহাপ্রভু সশিষ্যে বিখ্যাত শৈবতীর্থ ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ইহার অপর নাম "গুপ্তকাশী", "হরক্ষেত্র" বা "একাম্রকানন"। ভুবনেশ্বরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ভুবনেশ্বরে শ্রীচৈতন্যদেব একদিন মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। এস্থানে তিনি বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বরকে (কৃত্তিবাস মহাদেব) সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও তাঁহার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন এবং "শিবাষ্টক স্তোত্র" ভক্তিভরে গলদশ্রুলোচনে আবৃত্তি করিয়া দেবদেবের প্রীতিসম্পাদন করিলেন। অনন্তর একাম্রকাননস্থিত অসংখ্য শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া কপিলেশ্বর মহাদেবের পূজা দিতে গমন করেন। তৎপরে ভুবনেশ্বর পশ্চাতে রাখিয়া পুরীর পথে অগ্রসর হয়েন।

পুরীর পথে মহাপ্রভু প্রথমতঃ কমলপুরে উপস্থিত হইলেন। ইহার নিকটেই তরঙ্গী ভার্গবী নদী। তৎকালে ইহা অধিকতর প্রশস্ত ও বেগবতী ছিল এবং নৌযানে এই নদী পার হইতে হইত। তিনি ভার্গবীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিতে যাত্রা করিবার সময়ে শ্রীনিত্যানন্দের নিকট স্বীয় দণ্ড রক্ষা করিয়া যান। নিত্যানন্দ, প্রভুর সহিত দেবদর্শনে গমন করেন নাই। তিনি প্রভুর অবর্ত্তমানে তাঁহার সন্ন্যাস-দণ্ড ত্রিখণ্ডে ভাঙ্গিয়া নদীজলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া ভার্গবী সাধারণের নিকট দণ্ডভাঙ্গা" নামে পরিচিত।

মহাপ্রভু দণ্ডভাঙ্গা নৌকাযোগে পার হইলেন। কথিত আছে যে, মাঝি তাঁহাকে বিনাদানে পার করিতে সম্মত হয় নাই। তাহাতে তিনি তাহার নিকট অপূর্ব্ব ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে পর মাঝি ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া সশিষ্যে তাঁহাকে নদী পার করিয়া দেয়। উড়িষ্যায় বিষ্ণুর ষড়ভূজ মূর্ত্তি অনেক স্থানে পূজিত হইতে দেখা যায়।

ভার্গবী পার হইয়া মহাপ্রভু তুলসীচত্বর নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থান হইতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের অভ্রভেদী চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্বজচক্রসুশোভিত উত্তুঙ্গ মন্দিরচূড়া দর্শন করিয়া তিনি ভক্তির আবেশে বিহ্বল হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিতাবস্থায় জগন্নাথের নাম করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিশ্রাম প্রেমাশ্রুবারি বিগলিত হইয়া ধরাতলকে সিক্ত করিল। গোবিন্দদাস এই ঘটনা যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ ভক্তির উচ্ছাস পৃথিবীতে কেহ কখন নয়নগোচর করিয়াছে কি না সন্দেহ! দর্শন করা দূরে থাকুক, ইহার বিষয় পাঠ করিলে অতি পাষণ্ডের মনও ক্ষণকালের জন্য ভক্তিরসে আর্দ্র

হইয়া পড়ে। মহাপ্রভু তখন তাঁহার মনশ্চক্ষুতে জগতের স্বামীকে তাঁহার অতি প্রিয় বাল-গোপাল মূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঐ দেখ, আমার কৃষ্ণ আমারই অপেক্ষায় মন্দিরের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন।" ভগবানের জন্য কি তন্ময়তা, কি নিষ্ঠা, কি ব্যাকুলতা! প্রকৃত ভক্ত ভিন্ন ইহার গাঢ়ত্ব বা গূঢ়ত্ব অপর কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

মহাপ্রভু আঠার নালায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার এই মহাভাব কতক পরিমাণে সম্বরণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এবং তাঁহার সহচরদিগের একমাত্র চিন্তা, কি উপায়ে অবিলম্বে শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। মহাপ্রভু দ্রুতপদে মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইয়া জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন মাত্র আবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন :—

"মূরছিত হইল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া।
যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়া॥"

চৈতন্য চরিতামৃতে এই ঘটনা এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল অস্থির॥
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥"

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মন্দির-প্রবেশকালে তিনি ভাবাবিষ্টাবস্থায় গরুড়স্তম্ভ প্রথমে দর্শন করিয়া তাহাকেই জগন্নাথ বোধে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং তাহাতে শিরোদেশে সমধিক আঘাত প্রাপ্ত হন।

তাঁহার মহাভাব ও মূর্চ্ছা মন্দিরস্থ যাবতীয় লোকের হৃদয়ে বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল। সেই সময়ে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের

ভগিনীপতি গোপীনাথ ভট্টাচার্য্য পুরীতে সার্ব্বভৌমের আলয়ে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর ও তাঁহার সঙ্গীগণের সবিশেষ পরিচয় ছিল। সার্ব্বভৌম চৈতন্যদেবের সহিত ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন না; তিনি তাঁহার পিতা ও মাতামহের সহিত সহিত পরিচিত ছিলেন। মহাপ্রভুর মূর্চ্ছিত দেহ মন্দির হইতে সার্ব্বভৌম ঠাকুরের আলয়ে তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক নীত হইল এবং তাঁহারা সকলে গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনে মাতিয়া গেলেন। এই সংকীর্ত্তনের রব মহাপ্রভুর কর্ণে প্রবেশ করিবার পর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলেন।

তিনি কয়েকদিন সশিষ্যে সার্ব্বভৌমের বাটীতে অবস্থান করিয়া নানা শাস্ত্র বিচারের পর এই বিশ্ববিশ্রুত বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতকে ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রথমবার পুরী যাইয়া ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন মাস তথায় অবস্থিতি করেন এবং কীর্ত্তনাদি দ্বারা পুরীর অধিবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে হরিপ্রেমে মাতোয়ারা করিয়াছিলেন। পুরী হইতে তিনি দাক্ষিণাত্যে হরিনাম বিলাইতে গমন করেন এবং তথা হইতে উত্তর-পশ্চিমে বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থাদি দর্শন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামীগণ কর্ত্তৃক সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলাসমৃদ্ধ বৃন্দাবনধাম পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমগ্র উৎকল-প্রদেশ হরিনামের ভক্তি-স্রোতে ডুবিয়া গিয়াছিল। এই দুই ঘটনা চিরদিন ধর্ম্মজগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

মহাপ্রভু ইহার পরে কয়েকবার পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক ভক্তশিষ্য তাঁহার সহিত পুরীধামে স্থায়ীভাবে বাস করিতেন। বাংলার গৌরভক্ত বৈষ্ণবগণ রথযাত্রায়

সময়ে বহু উপহার লইয়া পুরীতে প্রভুর সহিত মিলিত হইতেন। গম্ভীরা মঠে, জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে, শ্রীমন্দিরে এবং সাগরতটে তিনি অনেকানেক লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষজীবনের অষ্টাদশ বর্ষকাল অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীক্ষেত্রে অতিবাহিত হইয়াছিল এবং এই তীর্থেই তাঁহার তিরোভাব হয়। বৈষ্ণব পদ্য-সাহিত্যে তাঁহার উৎকল-লীলা বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে তাঁহার আলোচনা অনাবশ্যক।

শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব।*

(১)
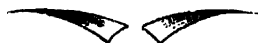
ওঁ নমঃ শ্রীগুরবে। নমো গণেশায়। গোবিন্দং সচ্চিদানন্দং নত্বা শ্রীরঘুনন্দনঃ। স্মৃতিতত্ত্বে বিধিং বক্তি ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥ অথ পুরুষোত্তমদর্শনবিধানাদি তত্র ব্রহ্মপুরাণং। 'পৃথিব্যাং ভারতং বর্ষং কর্ম্মভূমিরুদাহৃতা। ন খল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং ভূমৌ কর্ম্ম বিধীয়তে'॥ তত্রাস্তে ভারতে বর্ষে দক্ষিণোদধি সংস্থিতঃ। ওড্রদেশ ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বমোক্ষপ্রদায়কঃ। সমুদ্রাদুত্তরে তীরে যাবদ্বিরজমণ্ডলং। তীর্থকাণ্ড কল্পতরৌ বামনপুরাণং। উপোষ্য রজনীমেকাং বিবজাং স নদীং যযৌ। স্নাত্বা বিরজসে তীর্থে দত্ত্বা পিণ্ডং পিতৄংস্তথা। দর্শনার্থং যযৌ ধীমানজিতং পুরুষোত্তমং। তদ্দৃষ্ট্বা পুণ্ডরীকাক্ষমক্ষরং পরমং শুচিঃ। উপোষ্য স তিলন্দত্ত্বা মাহেন্দ্রং দক্ষিণং যযৌ। উপোষ্য স্থিত্বা। তথা। আদৌ যদ্দারুপ্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষং। তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলং। অস্য ব্যাখ্যা আশ্বলায়নভাষ্যে। আদৌ বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্ত্তমানং যদ্দারুময় পুরুষোত্তমাখ্য দেবতাশরীরং প্লবতে জলস্যোপরি বর্ত্ততে অপুরুষং নির্ম্মাত্রা রহিতত্বেনাপুরুষং তদালভস্ব দুর্দ্দনো হে হোতঃ তেন দারুময়েন দৈবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ। অথর্ব্ব বেদেঽপি। আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোর্ম্মধ্যে অপুরুষং। তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলং। অত্রাপি তথৈবার্থঃ। মধ্যে তীরে। স্কন্দপুরাণে। ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রসঙ্গে

---

* শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বিরচিত।

ভক্ত্যানিষ্কাম কর্ম্মভিঃ। উৎসৃজ্য বিত্তকোটিন্তু যন্নমায়াতনং কৃতং।
ভঙ্গেহপ্যেতস্য রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া। ব্রহ্মপুরাণে বিরজে
বিরজানাম ব্রহ্মণাসংপ্রতিষ্ঠিতা। তস্যা সন্দর্শনে মর্ত্ত্যঃ পুণাত্যা
সপ্তমং কুলং। স্নাত্বা দৃষ্ট্বাতু তাং দেবীং ভক্ত্যা পূজ্য প্রণম্য চ।
নরঃ স্বকুলমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি। আস্তে বৈতরণী নাম
সর্ব্বপাপহরা নদী। তস্যাং স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
বৈতরণীমধিকৃত্য ভারতে। আঘাতভাগং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো
ভাগমুত্তমং॥ দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামস্থভযাক্রুদ্রস্য শাশ্বতীং। ইমাং গাথাং
সমুদ্ধৃত্য মম লোকং স গচ্ছতি। দেবযানং তস্য পন্থাঃ শক্রস্যেব
বিরাজতে। ব্রহ্মপুরাণে। আস্তে স্বযম্ভূস্তত্রৈব ক্রোড়রূপী হরিঃ
স্বয়ং। দৃষ্ট্বা প্রণম্য তং ভক্ত্যা নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। তৎ।।
বিরজায়াং মম ক্ষেত্রে পিণ্ডদানং করোতি যঃ। স করোত্যক্ষয়াং
তৃপ্তিং পিতৃণাং নাত্র সংশয়ঃ। মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ বিরজে যে
কলেবরং। পরিত্যজন্তি পুরুষাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ। তথা।
নদীতত্র মহাপুণ্যা বিন্ধ্যপাদবিনির্গতা। চিত্রোৎপলেতি বিখ্যাতা
সর্ব্বপাপহরা শুভা। চিত্রোৎপলা মহানদী। তথা। সত্যং সত্যং
পুনঃ সত্যং ক্ষেত্রং তৎ পরমং মহৎ। পুরুষাখ্যং সকৃদ্দৃষ্ট্বা সাগরাম্ভঃ
সকৃন্মৃতঃ ব্রহ্মবিদ্যাং সকৃজ্জপ্ত্বা গর্ভবাসো ন বিদ্যতে। পুরুষোত্তম
ক্ষেত্রদর্শনসাগর মরণব্রহ্মবিদ্যাজপানাং প্রত্যেকং গর্ভবাসাভাবঃ ফলং।
কূর্ম্মপুরাণে। তীর্থং নারায়ণস্যান্য নাম্নাতু পুরুষোত্তমং। অত্র
নারায়ণ শ্রীমানাস্তে পরমপুরুষঃ। পূজয়িত্বা পরং বিষ্ণুং তত্র
স্নাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ। ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
শ্রাদ্ধকাণ্ড কল্পতরৌ বামনপুরাণং। ধূতপাপং তথা তীর্থং সমুদ্রো
দক্ষিণস্তথা। গোকর্ণে গজকর্ণশ্চ তথা চ পুরুষোত্তমঃ। এতেষু

পিতৃতীর্থেষু শ্রাদ্ধমানন্ত্যমশ্নুতে। ব্রহ্মপুরাণে। চক্রং দৃষ্ট্বা হরের্দ্দূরাৎ প্রাসাদো পরিসংস্থিতং। সহসামুচ্যতে পাপাৎ সর্ব্বস্মাদিতি মে মতিঃ। তথা। মার্কণ্ডেয়হ্রদে গত্বা স্নাত্বা চোদঙ্মুখঃশুচিঃ। নিমজ্জেৎ ত্রীংশ্চ বারাংশ্চ ইমং মন্ত্রমুদীরয়ন্। ওঁ সংসারসাগরে মগ্নং পাপগ্রস্তমচেতনং। পাহি মাং ভবনেত্রঘ্ন ত্রিপুরারে নমোঽস্তুতে। নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ। স্নানং করোমি দেবেশ মম নশ্যতু পাতকং। নাভিমাত্র জলে স্থিত্বা বিধিবদ্দেবতা মুনীন্। তিলোদকেন মতিমান্ পিতৄনন্যাংশ্চ তর্পয়েৎ। স্নাত্বৈবতু তথা তত্র ততোগচ্ছেচ্ছিবালয়ং। প্রবিশ্যদেবতাগারং কৃত্বাতু ত্রিঃ প্রদক্ষিণং। মূলমন্ত্রেণ সংপূজ্য মার্কণ্ডেয়স্য চেশ্বরম্। অঘোরেণতু মন্ত্রেণ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ। ওঁ নমঃ শিবায়েতি মূলমন্ত্রঃ। অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। ইত্যঘোরমন্ত্রঃ। তথা ত্রিলোচন নমস্তেঽস্তু নমস্তে শশিভূষণ। পাহি মাং ত্বং বিরূপাক্ষ মহাদেব নমোঽস্তুতে। মার্কণ্ডেয়হ্রদে ত্বেবং স্নাত্বা দৃষ্ট্বাতু শঙ্করম্। দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। পাপৈ সর্ব্বৈর্ব্বিনির্মুক্তঃ শিবলোকং স গচ্ছতি। তত্র ভুক্ত্বা বরাণ্ ভোগান্ যাবদাহূতসংপ্লবং। ইহলোকং সমাসাদ্য ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ। কল্পবৃক্ষং ততোগত্বা কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং। পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা মন্ত্রেণানেন তং বটং। ওঁ নমোঽব্যক্তরূপায় মহাপ্রলয় প্রাণতে। মহাহ্রদোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমোনমঃ। অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট। ন্যগ্রোধ হরমে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোঽস্তুতে। ভক্ত্যা প্রদক্ষিণং কৃত্বা মহৎ কল্পবটং নরঃ। সহসা মুচ্যতে পাপাৎ জীর্ণত্বচ ইবোরগঃ। ছায়াং তস্য সমাসাদ্য কল্পবৃক্ষস্য ভো দ্বিজাঃ। ব্রহ্মহত্যাং নরো জহ্যাৎ পাপেষন্যেষু কা কথা। দৃষ্ট্বাং কৃষ্ণাঙ্গসম্ভূতং ব্রহ্মতেজোময়ং বটং। ন্যগ্রোধাকৃতিনং বিষ্ণুং প্রণিপত্য চ ভো দ্বিজাঃ।

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি চাধিকং। তথা স্ববংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি। বৈনতেয়ং নমস্কৃত্য কৃষ্ণস্য পুরতঃ স্থিতম্। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তস্ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। দৃষ্ট্বা বটং বৈনতেয়ং যঃ পশ্যেৎ পুরুষোত্তমং। সঙ্কর্ষণং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পরমাং গতিং। প্রবিশ্যায়তনং বিষ্ণোঃ কৃত্বা তং ত্রিঃ প্রদক্ষিণং। সঙ্কর্ষণং সমন্ত্রেন ভক্ত্যা পূজ্য প্রসাদয়েৎ। নমস্তে হলধৃগ্রাম নমস্তে মুষলায়ুধ। নমস্তে রেবতীকান্ত নমস্তে ভক্তবৎসল। নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ নমস্তে ধরণীধর। প্রলম্বারে নমস্তেহস্তু পাহি মাং কৃষ্ণপূর্ব্বজ। এবং প্রসাদ্য চানন্তমজেয়ং ত্রিদশার্চ্চিতং। কৈলাসশিখরাকারং চন্দ্রাংকান্ততরাননং। নীলবস্ত্রধরং দেবং ফণাবিকলমস্তকং। মহাবলং হলধরং কুণ্ডলৈক বিভূষণং। রৌহিণেয়ং নরো ভক্ত্যা লভেতাভিমতং ফলং। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি। আভূত সংপ্লবং যাবৎ ভক্ত্যাতত্র সুখং নরঃ। পুণ্যক্ষয়াদিহাগত্য প্রভবো যোগিনাং কুলে। ব্রাহ্মণ প্রভবো ভূত্বা সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগঃ। জ্ঞানং তত্র সমাসাদ্য মুক্তিং প্রাপ্নোতি দুর্লভাং। এবমভ্যর্চ্চ হলিনং ততঃ কৃষ্ণং বিচক্ষণঃ। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রেণ পূজয়েৎ সুসমাহিতঃ। আভূত সংপ্লবং যাবৎ ভূত সংপ্লবং যাবৎ আপ্রলয়ং যাবৎ। ছন্দসো ভকারস্য হকারঃ। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রেণ। ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ইত্যনেন দ্বিষকবর্ণমন্ত্রেণ ভক্ত্যা যে পুরুষোত্তমং। পূজয়ন্তি সদা ধীরাস্তে মোক্ষং প্রাপ্নুবন্তি বৈ। তস্মাত্তেনৈব মন্ত্রেণ ভক্ত্যা কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্। সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ। জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় সর্ব্বাঘনাশন। জয়চাণূর কেশিঘ্ন জয় কংসনিসূদন। জয় পদ্মপলাশাক্ষ জয় চক্রগদাধর। জয় নীলাম্বুদশ্যাম জয় সর্ব্বসুখপ্রদ॥ জয় দেব জগৎপূজ্য জয় সংসারনাশন। জয় লোকপতে নাথ জয় বাঞ্ছাফলপ্রদ। সংসারসাগরে ঘোরে নিঃসারে দুঃখফেনিলে।

ক্রোধগ্রহাকুলে রৌদ্রে বিষয়োদক সংপ্লবে। নানা রোগোর্ম্মিকলিলে মহাবর্ত্ত সুদুস্তরে। নিমগ্নোঽহং সুরশ্রেষ্ঠ ত্রাহি মাং পুরুষোত্তম। এবং প্রসাদ্য দেবেশং বরদং ভক্তবৎসলং। সর্ব্বপাপহরং দেবং সর্ব্বকাম-ফলপ্রদং। জ্ঞানদং দ্বিভুজং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণং। মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননং। শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণং। সর্ব্বলক্ষণ-সংযুক্তং বনমালাবিভূষিতং। দৃষ্ট্বা নরোঽঞ্জলিংবদ্ধা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ। অশ্বমেধসহস্রাণাং ফলং প্রাপ্নোতি ভো দ্বিজাঃ। যৎফলং সর্ব্বতীর্থেষু স্নানদানে প্রকীর্ত্তিতং। নরস্তৎ ফলমাপ্নোতি দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং প্রণম্য চ। তথা। কিঞ্চাত্র বহুনোক্তেন মাহাত্ম্যং তস্য ভো দ্বিজাঃ। দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং নরো ভক্ত্যা মোক্ষমাপ্নোতি দুর্ল্লভং। পাপৈর্বিমুক্তঃ শুদ্ধাত্মা জন্মকোটিসমুদ্ভবৈঃ। অত্র যদ্যপি দৃষ্ট্বা প্রণম্যেতি শ্রবণাৎ সমুচ্চিত এব ফলান্বয়োঽন্যথা বাক্যভেদঃ স্যাত্তথাপি শেষে দর্শনমাত্র এব ফলোপসংহারাৎ প্রত্যেকং ফলান্বয় ইতি বদন্তি ব্রহ্মপুরাণে। ততঃ পূজ্য সমন্ত্রেণ সুভদ্রাং ভক্তবৎসলাং। প্রসাদয়েত্ততো বিপ্রাঃ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ। স্বমন্ত্রেণ প্রণবাদিনমোঽন্তেন নাম্না। যথা গরুড়ে। প্রণবাদিনমোঽন্তেন চতুর্থ্যাখ্যাঞ্চ সত্তমাঃ। দেবতায়াঃ স্বকং নাম মূল মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। চতুর্থী আখ্যা যত্র তত্তথা চতুর্থ্যন্তমিতি যাবৎ। নমস্তে সর্ব্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। পাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে। এবং প্রসাদ্য তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং জগদ্ধিতাং। বলদেবস্য ভগিনীং সুভদ্রাং বরদাং শিবাং। কামগেন বিমানেন নরো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ। নিষ্ক্রম্য দেবতাগারাৎ কৃতকৃত্যো ভবেন্নরঃ। প্রণম্যায়তনং পশ্চাৎ ব্রজেত্তত্র চ ভো দ্বিজাঃ। ভক্ত্যা দৃষ্ট্বা চ তং দেবং প্রণম্য নরকেশরিং। মুচ্যতে পাতকৈর্ম্মর্ত্যঃ সমস্তৈর্নাত্র সংশয়ঃ। নরকেশরিং নরকেশরিণং। তথা। অনন্তাখ্যং বাসুদেবং

দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা প্রণম্যচ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো নরো যাতি পরং পদং।
তথা। শ্বেতগঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা য পশ্যেৎ শ্বেতমাধবং। তথা।
কুশাগ্রেণাপি রাজেন্দ্র শ্বেতগঙ্গেয়মম্বুচ। পৃষ্ট্বা স্বর্গং গমিষ্যন্তি মদ্ভক্তা
যে সমাহিতাঃ। যশ্চিমাং প্রতিমাং লোকে মাধবাখ্যাং শশিপ্রভাং।
বিহায় সর্ব্বলোকান্ বৈ মমলোকে মহীয়তে। তথা। শ্বেতমাধবমালোক্য
সমীপে মৎস্যমাধবং। একার্ণব জলে মগ্নং রোহিতং রূপমাস্থিতং।
দেবানাং তারণার্থায় রসাতলতলেস্থিতং। তথা। অঘাবতারণং
রূপং মাধবং মৎস্যরূপিনং। প্রণম্য প্রযতো ভূত্বা সর্ব্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে।
পূর্ব্বোক্তেন তু মন্ত্রেণ নমস্কৃত্য চ তং বটং। দক্ষিণাভিমুখো গচ্ছেৎ
ধন্বন্তরশতত্রয়ং। ওঁ নামোহব্যক্তরূপায়েত্যাদিনা। ধনুশ্চতুর্হস্তং।
উগ্রসেনং পুরা দৃষ্ট্বা স্বর্গদ্বারেণ সাগরং। গত্বাচম্যশুচিস্তত্র ধ্যাত্বা
নারায়ণং পরং। ন্যসেদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং পশ্চাদ্ধস্তশরীরয়োঃ। সমুদ্রোদকেন
নাচমেৎ তস্যাপেয়ত্বস্য তৈত্তিরীয়শ্রুতাবুক্তত্বাৎ। যৈঃ কৃতঃ সর্ব্ব-
ভক্ষোহগ্নিঃ সত্বপেয়ো মহোদধিঃ। ক্ষয়ীচাপ্যুদিতশ্চন্দ্রঃ কোন পশ্যেৎ
প্রকোপ্য তান্। ইতি মনুবচনাভিহিতত্বাচ। যৈর্ব্রাহ্মণৈঃ। তথা।
ওঙ্কারঞ্চ নমস্কারং যৎকিঞ্চিজ্জীব সংজ্ঞিতং। অঙ্গুষ্ঠে হস্তে পাদে চ
শিখায়াং শিরসি ন্যসেৎ। শেষান্ হস্ততলং যাবৎ তর্জ্জন্যাদিষু
বিন্যসেৎ। ওঁ নম ইতি বর্ণং হস্তাঙ্গুষ্ঠয়োঃ হস্তয়োঃ পাদয়োঃ শিখায়াং
শিরসি চ ন্যস্যনাকারং তর্জ্জন্যোঃরাকারং মধ্যময়োঃ য়কারমনামিকয়োঃ
ণকারং কনিষ্ঠয়ো যকারং করতলয়োর্ন্যসেৎ। ওঁকারং বামপাদেতু
নকারং দক্ষিণে ন্যসেৎ। মোকারং বামকট্যান্তু নাকারং দক্ষিণে ন্যসেৎ।
রাকারং নাভিদেশেতু যকারং বামবাহুকে। নাকারং দক্ষিণে ন্যস্য
যকারং মূর্দ্ধিবিন্যসেৎ। অধশ্চোর্দ্ধেচ হৃদয়ে পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ।
ধ্যাত্বা নারায়ণং পশ্চাদাচরেৎ ক বচং বুধঃ। পূর্ব্বে মাং পাতু গোবিন্দো

দক্ষিণে মধুসূদনঃ। ভূতলে পাতুবারাহস্তথোর্দ্ধে ত্রিবিক্রমঃ। কৃত্বৈবং কবচং পশ্চাদাত্মানং চিন্তয়েদ্ধরিং। অহং নারায়ণোদেবঃ শঙ্খচক্র-গদাধরঃ। এবং ধ্যাত্বা তথাত্মানং ইমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। ওঁ ত্বমগ্নি-দ্বিপদাং নাথ রেতোধাঃ কামদীপনঃ। প্রধানঃ সর্ব্বভূতানাং জীবানাং প্রভুরব্যয়ঃ। অমৃতস্যারণিস্ত্বং হি দেবযোনিরপাং পতিঃ। বৃজিনং হর মে সর্ব্বং তীর্থরাজ নমোঽস্তুতে। এবমুচ্চার্য্য বিধিবৎ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ। অন্যথাতু দ্বিজশ্রেষ্ঠা স্নানং তত্র ন শস্যতে। বনপর্ব্বনি অগ্নিস্তেজোবড়বাচ দেহো রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ। এবং ব্রুবন্ পাণ্ডবসত্যবাক্যমতোঽবগাহেত পতিং নদীনাং। অন্যথাতু কুরুশ্রেষ্ঠ দেবযোনিরপাং পতিঃ। কুশাগ্রেণাপি কৌন্তেয়........* মহোদধিঃ। বড়বা ইত্যত্র ইড়াচেতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ব্রহ্মপুরাণে। কৃত্বা চাপ্ দৈবতৈর্ম্মন্ত্রৈরভিষেকঞ্চ মার্জ্জনম্। অন্তর্জ্জলে জপেৎ পশ্চাৎ ত্রিরাবৃত্যাঘমর্ষণম্। ব্রহ্মদৈবতৈরাপোহিষ্ঠেত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ। অঘ-মর্ষণঞ্চ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চেত্যাদি। দেবান্ পিতৄণ্ তথাচান্যান্ সন্তর্প্যাচাম্য বাগ্‌যতঃ। অন্যান্ ঋষীন্। হস্তমাত্রং চতুষ্কোণং চতুর্দ্বারং সুশোভনং। পুরং বিলিখ্য ভো বিপ্রাস্তীরে তস্য মহোদধেঃ। মধ্যে তত্র লিখেৎ পদ্মমষ্টপত্রং সকর্ণিকং। একং মণ্ডলমালিখ্য পূজয়েত্তত্র ভো দ্বিজাঃ। অষ্টাক্ষর বিধানেন নারায়ণমজং বিভুং।... *অর্চ্চনং যে ন জানন্তি হরের্ম্মন্ত্রৈর্যথোদিতং। তে তত্র মূলমন্ত্রেণ পূজয়ন্তমচ্যুতং সদা। ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্রঃ। এবং সম্পূজ্য বিধিবদ্ ভক্ত্যা তং পুরুষোত্তমং। প্রণম্য শিরসা পশ্চাৎ সাগরন্তু প্রসাদয়েৎ। প্রাণস্ত্বং সর্ব্বভূতানাং যোনিশ্চ সরিতাং পতে। তীর্থরাজ নমস্তভ্যং ত্রাহি মামচ্যুতপ্রিয়। অত্রচ। পিপ্পলাদসমুদ্ভূতে কৃত্যে লোক ভয়ঙ্করি। পাষাণং

* পুঁথিতে এই স্থান অস্পষ্ট।

তে ময়াদত্তমাহারং পরিকল্পয়। ইতি মন্ত্রেণ পাষাণপ্রক্ষেপ। সদাচার সিদ্ধ ইতি বিদ্যাকরঃ। ব্রহ্মপুরাণে। তীর্থেচাভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ নারায়ণ-মনাময়ং। রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ প্রণিপত্য চ সাগরং। দশানামশ্ব-মেধানাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ। সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিতঃ। কুলৈক বিংশমুদ্ধৃত্য বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি। পিতৃণাম্ যে প্রযচ্ছন্তি পিণ্ডং তত্র বিধানতঃ। অক্ষয়াং পিতরস্তেষা° তৃপ্তিং সংপ্রাপ্নুবন্তি বৈ। কোট্যা নবনবত্যশ্চ তত্র তীর্থানি সন্তি বৈ। তস্মাৎ স্নানঞ্চ দানঞ্চ হোমং জপস্সুরার্চ্চনং। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তত্র চাক্ষয়ং ভবতি দ্বিজাঃ। ততো গচ্ছেৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তীর্থং যজ্ঞাঙ্গসম্ভবং। ইন্দ্রদ্যুম্নসরোনাম যত্রাস্তে পাবনং শুভং। গত্বা তত্র শুচিঃ শ্রীমানাচম্যমনসা হরি°। ধ্যাত্বোপ-স্থায়চ জপন্নিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ। অশ্বমেধাঙ্গসম্ভূততীর্থ সর্ব্বাঘনাশন। স্নানং ত্বয়ি করোম্যদ্য পাপং হর নমোঽস্তুতে॥ এবমুচ্চার্য্য বিধিবৎ স্নাত্বা দেবানৃষীন্ পিতৃণ্। তিলোদকেন চান্যাংশ্চ সন্তর্প্যাচম্য বাগ্‌যতঃ। দত্ত্বা পিতৃণাং পিণ্ডাংশ্চ সম্পূজ্য পুরুষোত্তমং। দশাশ্বমেধাধিকং সম্যক্ ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ। তথা। নানানদ্য সমুদ্রাশ্চ সপ্তাহং পুরুষোত্তমে। জ্যৈষ্ঠে শুক্লদশম্যাদৌ প্রত্যক্ষং যান্তি সর্ব্বদা। স্নানদানাদিকং তস্মাৎ দেবতাপ্রেক্ষণাদিকং। যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে তাত তস্মিন্‌কালেঽক্ষয়ং ভবেৎ। এবং কৃত্বা পঞ্চতীর্থমেকাদশ্যা মুপোষিতঃ। জ্যৈষ্ঠে শুক্লদশম্যাস্তু পশ্যেৎ শ্রীপুরুষোত্তমং। স পূর্ব্বোক্তফলং প্রাপ্য ক্রীড়িত্বা চাচ্যুতালয়ে। প্রযাতি পরমং স্থানং যস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ। তীর্থভেদেন স্নানান্তর নিবৃত্তিমাহ নিগমঃ। নাবর্ত্তয়েৎ পুনঃ কর্ম্ম তর্পণাদিকমন্বহং। কাম্য নৈমিত্তেকে হিত্বা একং হ্যেকত্র বাসরে। ব্যপোহ্য চাষ্টমং ভাগমুদয়াদ্ যত্র কুত্র চিৎ। তির্থ্যোযুগ্মেঽপ্যযুগ্মে বা যদ্ যদাহ্নিকমাচরেৎ। ব্রহ্মপুরাণে। মার্কণ্ডেয়া বটঃ কৃষ্ণো রৌহিণেয়ো মহোদধি। ইন্দ্রদ্যুম্ন

সরশ্চৈব পঞ্চতীর্থ বিধিঃ স্মৃতঃ। মার্কণ্ডেয়াবটঃ মার্কণ্ডেয়হ্রদঃ কৃষ্ণোঽক্ষয়বটঃ। ন্যগ্রোধাকৃতিনং বিষ্ণুমিতি পূর্ব্বোক্তাৎ। বরাহ-পুরাণে। যস্তিষ্ঠেদেকপাদেন কুরুক্ষেত্রে নরাধিপ। বর্ষানামযুতং সপ্ত বায়ুভক্ষোজিতেন্দ্রিয়ঃ। জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাস্তু বিশেষতঃ। পুরুষোত্তমমাসাদ্য ততোঽধিকফলং লভেৎ। অগ্নিপুরাণং। বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিতা। তত্র মাং লেপয়দ্ গন্ধলেপ-নৈরতি শোভনং। তথা। জ্যৈষ্ঠে অহঞ্চাবতীর্ণঃ তৎপুণ্যাং জন্মবাসরং। তস্যাং মে স্নপনং কুর্য্যাৎ মহাস্নানবিধানতঃ। জ্যৈষ্ঠে প্রাতঃস্নানকালে ব্রহ্মণাসহিতঞ্চ মাং। রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ। তথা। আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা। তস্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ। যাত্রোৎসবং প্রবর্ত্ত্যাথ প্রীণয়েচ্চদ্বিজাং বহূন্। তথা। ঋক্ষাভাবে তিথৌ কার্য্যা সদা স্যা প্রীতয়ে মম। স্কন্দপুরাণে। ফাল্গুন্যাং ক্রীড়নং কুর্য্যাৎ দোলায়াং মমভূমিপ। ব্রহ্ম পুরাণে। উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্বয়নে পুরুষোত্তমে। দৃষ্ট্বা রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজেন্নরঃ। নরো দোলাগতং দৃষ্ট্বা গোবিন্দং পুরুষোত্তমং। ফাল্গুন্যাং সংযতোভূত্বা গোবিন্দস্য পুরং ব্রজেৎ। বিষু-বদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থী বিধানতঃ। কৃত্বা মঞ্চগতং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা নত্বাথ ভো দ্বিজাঃ। নরঃ সমস্তযজ্ঞানাং প্রাপ্নোতি দুর্লভং ফলং। বিমুক্ত সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি। যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দন-ভূষিতং। বৈশাখস্য সিতে পক্ষে স যাত্যচ্যুতমন্দিরং। তথা। মাসি জ্যৈষ্ঠেতু সংপ্রাপ্তে নক্ষত্রে শক্রদৈবতে। পৌর্ণমাস্যাং তথা স্নানং সর্ব্বকালং হরের্দ্বিজা। তস্মিন্ কালেতু যে মর্ত্ত্যাঃ পশ্যন্তি পুরুষোত্তমং। বলভদ্রং সুভদ্রাঞ্চ স যাতি পদমব্যয়ম্। তথা। স্নানং পশ্যতি যঃ কৃষ্ণং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখং। অথ কিং পুনরুক্তেন ভাষিতেন পুনঃ পুনঃ।

যৎকিঞ্চিৎ কথিতঞ্চাত্র ফলং পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ। বেদশাস্ত্রে পুরাণে চ ভারতেচ দ্বিজোত্তমাঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু তথান্যত্র মণীষিভিঃ। দৃষ্ট্বা নরো লভেৎ কৃষ্ণং যৎ ফলং সহস্রায়ুতং। তৎফলং ভদ্রয়াসার্দ্ধং ব্রজন্তং দক্ষিণামুখং। গুণ্ডিচামণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি রথেস্থিতং। কৃষ্ণং বলং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি পরমং হরেঃ। যে পশ্যন্তি তদাকৃষ্ণং সপ্তাহং মণ্ডপে স্থিতং। হরিং রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে। তথা। সংবৎসরমুপোষিত্বা মাসত্রয়মথাপিবা। তেন......*হুতং তেন তপ্তং তেন তপো মহৎ। স যাতি পরমং স্থানং সত্র যোগেশরো হরি। তথা। দৃষ্ট্বা রামং......*কৃষ্ণং সহ সুভদ্রয়া। বিষ্ণুলোকং নরো যাতি সমুদ্ধৃত্য শতং কুলং। তথা। বার্ষিকাং শ্চতুরো মাসান্ যো বসেৎ পুরুষোত্তমে। কাশীবাসে যুগান্যষ্টৌ দিনেনৈকেন লভ্যতে। মৎস্যপুরাণে। কোটিজন্মকৃতং পাপং পুরুষোত্তমসন্নিধৌ। কৃত্বা সূর্য্যগ্রহে স্নানং বিমুঞ্চতি মহোদধৌ। ব্রহ্মপুরাণে। পথি শ্মশানে গৃহমণ্ডপে বা রথ্যাপ্রদেশেহপিচ যত্র তত্র। ইচ্ছন্ননিচ্ছন্নাপি তত্র তত্র সন্তজ্য দেহং লভতে চ মোক্ষং। দেহং ত্যজন্তি পুরুষা যে তত্র পুরুষোত্তমে। কল্পবৃক্ষং সমাসাদ্য মুক্তাস্তে নাত্র সংশয়ঃ। বটসাগরয়োর্ম্মধ্যে যে ত্যজন্তি কলেবরং। তে দুর্ল্লভং পরং মোক্ষমাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ। তথা তত্রৈব। তথা চৈবোৎকলে দেশে কৃত্তিবাসা মহেশ্বরঃ। সর্ব্বপাপহরং তস্য ক্ষেত্রং পরম দুর্ল্লভম্। লিঙ্গকোটি সমাযুক্তং বারাণস্যা সমং শুভং। একাম্বরেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টক সমন্বিতং। তীর্থং বিষ্ণুসরোনাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে দ্বিজোত্তমাঃ। দেবানৃষীন্ মনুষ্যাংশ্চ পিতৄণ্ সন্তর্পয়েত্ততঃ। তিলোদকেন বিধিনা নামগোত্রবিধানবিৎ। স্নাত্বৈব বিধিবত্তত্র সোহশ্বমেধফলং লভেৎ। পিণ্ডং যে সংপ্রযচ্ছন্তি পিতৃভ্যঃ সরসস্তটে। পিতৃণামক্ষয়াং

* পুঁথিতে এই স্থান অস্পষ্ট।

তৃপ্তিং তে কুর্ব্বন্তি ন সংশয়ঃ। ততঃ শম্ভোগৃহং গচ্ছেৎ বাগ্‌যতঃ সং-যতেন্দ্রিয়। প্রবিশ্য পূজয়েৎ পূর্ব্বং কৃত্বা তত্র প্রদক্ষিণং। আগমোক্তেন মন্ত্রেণ বেদোক্তেন চ শঙ্করং। অদীক্ষিতশ্চ বা দেবান্ মূলমন্ত্রেণ চার্চ্চয়েৎ। তথা। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো রূপযৌবনগর্ব্বিতঃ। কুলৈকবিংশমুদ্ধৃত্য শিবলোকং স গচ্ছতি। তথা। পশ্যেদ্দেবং বিরূপাক্ষং দেবীঞ্চ সারদাং শিবাং। গণচণ্ডং কার্ত্তিকেয়ং গণেশং বৃষভং তথা। কল্পদ্রুমঞ্চ সাবিত্রীং শিবলোকং স গচ্ছতি। এতন্ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ ক্ষেত্রঞ্চ প্রোক্তং সুদুর্ল্লভং। লোলার্কস্যোদধেস্তীরং ভুক্তি মুক্তি ফলপ্রদম্। স্নাত্বৈব সাগরে দত্ত্বা সূর্য্যায়ার্ঘ্যং প্রণম্য চ। নরো বা যদি বা নারী সর্ব্বকামফলং লভেৎ। ততঃ সূর্য্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্‌যতঃ। প্রবিশ্য পূজয়েদ্ ভানুং কুর্য্যাত্ত্ব ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্। দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি মানব॥

ইতি শ্রীহরিহর ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যবিরচিতং শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্বং সমাপ্তম্॥

কোনার্ক।

(১)
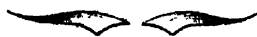
কপিল-সংহিতাতে যে চারিটী ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে কোনার্ক একটি। ইহার অপর নাম সূর্য্য, অর্ক, রবি বা পদ্মক্ষেত্র। পুরী হইতে ১০৷৷০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বদিকে ইহা অবস্থিত; সমুদ্র হইতে ১ ক্রোশমাত্র ব্যবধান। চন্দ্রভাগা নামক একটি শুষ্ক নদীর খাত ইহার উত্তরদিকে অবস্থিত। পুরী হইতে গো-যানে বালুকা-প্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইলে কোনার্কে পৌছিতে ১০।১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এখন মোটর-গাড়ীর সাহায্যে যাইবার সুবিধা হইয়াছে। এখানে পাল্কীর সাহায্যেও যাওয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে সূর্য্যদেবের একটি সুবৃহৎ সৌষ্ঠব-সম্পন্ন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। পুরাণ-কথিত প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নারদের কৌশলে পিতা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া এই স্থানে আগমন করেন এবং সূর্য্যের উপাসনা করিয়া শাপমুক্ত হয়েন। তিনি চন্দ্রভাগায় স্নান করিবার সময়ে নদীমধ্যে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন এবং তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কপিল-সংহিতাতে এই ক্ষেত্রে অবস্থিত অনেকানেক দেব-মন্দিরের বর্ণনা আছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই এক সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন অপর কোনটির বিশেষ সন্ধান পাওয়া যায় না।

কোনার্কের সূর্য্যমন্দির বিমান, জগমোহন ও ভোগমণ্ডপ, এই তিন অংশে বিভক্ত। জগমোহন ও ভোগমণ্ডপের মধ্যস্থলে নাটমন্দির নাই, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে এক খণ্ড উন্মুক্ত ও বিস্তৃত ভূখণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে। বিমানের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। অল্পদিন হইল, ইহার

কিয়দংশমাত্র বালুকার মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার পশ্চিমদিকে একখানি প্রস্তর-নির্ম্মিত বেদী বা সিংহাসন দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই বেদীর উপরে এক সময়ে সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিমানের প্রস্তর-নির্ম্মিত ভিত্তির গাত্রে অতি সুন্দর কারুকার্য্যসম্পন্ন ২৪ খানি রথচক্র ক্ষোদিত রহিয়াছে, দেখা যায়। অনুমান এই যে, ইহাবা সূর্য্যদেবের রথের চক্ররূপে তথায় অবস্থিতি করিতেছে। বিমানের প্রাচীরের অন্তঃস্থলে তিনটি বৃহদাকারের সূর্য্য-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায়। মধ্যের মূর্ত্তি বীরবেশে সজ্জিত ও অশ্বারূঢ়; ইহার দুই পার্শ্বে দুইটি ভগ্ন পুরুষমূর্ত্তি অবস্থিত।

পুরীমন্দিরের ইতিবৃত্তমধ্যে উল্লিখিত আছে যে, দেবদ্বেষী কালাপাহাড় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোনার্ক আক্রমণ করিয়া সূর্য্য-মন্দির ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ না হইলেও মন্দির ভাঙ্গিয়া এবং নানা প্রকারে স্থান অপবিত্র করিয়া দেবমন্দিরের রত্নমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করিয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। মন্দির এইরূপে ভগ্ন ও কলুষিত হইবার পর হিন্দুগণও উহা দেবস্থান বলিয়া পুনর্ব্বার ব্যবহার করে নাই এবং তদবধি উহা ধ্বংসাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

বিমানের সম্মুখেই জগমোহন। ইহার ছাদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রস্তরময় প্রাচীরে অনেকানেক স্ত্রীমূর্ত্তি এবং বিবিধ বাদ্যযন্ত্র ক্ষোদিত রহিয়াছে। ইহার চতুর্দ্দিকে চারিটি দ্বার; মধ্যের দরজার শিরোদেশে শিবমূর্ত্তি অবস্থিত। জগমোহনের কারু-কার্য্য অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম। পূর্ব্বদিকের দ্বারের উপরিভাগে নবগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। জগমোহনের পূর্ব্বাংশের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

জগমোহনের সম্মুখভাগে কিয়দ্দূরে ভোগমণ্ডপ অবস্থিত। ইহার চারিদিকেই উপরে উঠিবার সোপানাবলী আছে। ইহার পূর্ব্বদিকে
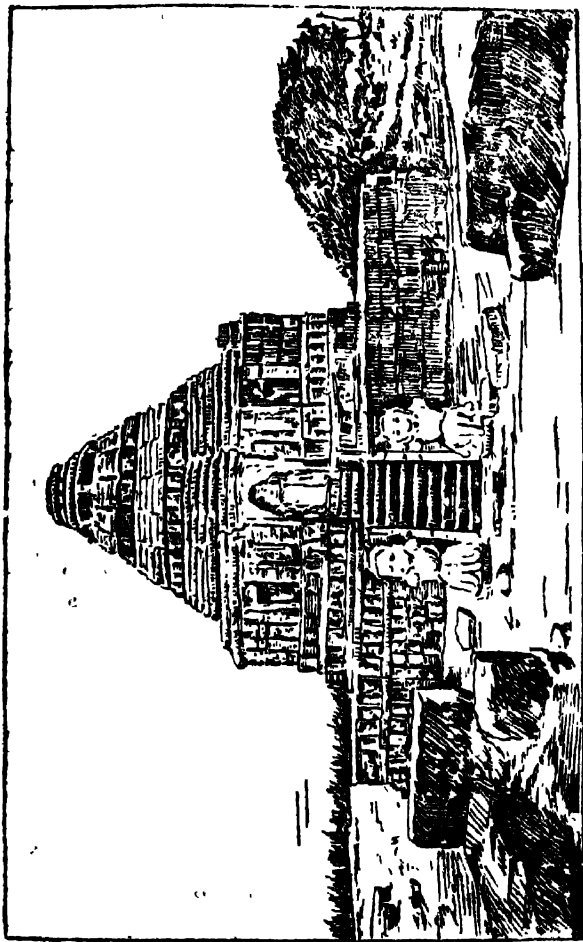
জগমোহনের পূর্ব্বাস্য—কোনার্ক।

দুইটী বৃহদাকৃতি প্রস্তরের সিংহমূর্ত্তি বালুকার মধ্যে অর্দ্ধ-প্রোথিতাবস্থায় অবস্থিত থাকিতে দেখা যায়। ভোগমণ্ডপের প্রাচীরের গাত্রে বিস্তর প্রস্তর-মূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে এবং ইহার মেঝের উপর অনেক প্রস্তর-মূর্ত্তি ও ফলক রক্ষিত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে সূর্য্য, বিষ্ণু, গঙ্গা, অগ্নি,, মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি এবং সীতার বিবাহ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনা ক্ষোদিত প্রস্তরফলকসমূহ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সূর্য্যমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে বামচণ্ডী বা মায়াদেবীর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার রাজা প্রথম নৃসিংহ দেবের রাজত্বকালে (১২৭৮ খৃষ্টাব্দে) এই সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে তিনিই ইহার নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত।

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত আছে যে উড়িষ্যার বার বৎসরের রাজস্ব ব্যয় করিয়া কোনার্কের এই সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময়ে পুরীর বার্ষিক রাজস্ব তিন ক্রোর টাকা ছিল। যাঁহারা ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যা সূক্ষ্ম বিচারকের চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি করিতে সমর্থ, তাঁহারা যে এই মন্দিরের বিশালতা, সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইবেন, সে বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গভর্ণমেণ্ট প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া উড়িষ্যার এই প্রাচীন কীর্ত্তির সংস্কারসাধন করিয়াছেন। ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞ।

পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে অরুণ-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোনার্ক হইতে পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

চিল্কাহ্রদ।

(৯)

যাঁহারা পুরী গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই চিল্কাহ্রদ না দেখিয়া ফিরিয়া আইসেন না। তীর্থ হিসাবে সেখানে কিছু না থাকিলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য মধ্যে মধ্যে তথায় অনেক লোকের সমাগম হয়।

এই হ্রদ উড়িষ্যার পূর্ব্ব-উপকূলে সমুদ্রতটে অবস্থিত। মাদ্রাজের রেলগাড়ী চিল্কা-হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করে। রেল্‌গাড়ীতে যাইবার সময় বহুদূর পর্য্যন্ত চিল্কাহ্রদের দৃশ্য নয়ন-পথে পতিত হয়। রেল্ লাইনের এক দিকে উত্তুঙ্গ ঘন-পাদপরাজি-বেষ্টিত ঘাটশৈলমালা, অপর দিকে চিল্কাহ্রদের বাত্যা-সংক্ষুব্ধ বহুবিস্তৃত ধূসর বর্ণের জলরাশি পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চিল্কা দেখিতে হইলে রম্ভা নামক রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে চিল্কা বেশী দূর নহে এবং এখানে বিশ্রাম করিবার স্থানের ব্যবস্থা আছে। এক দিনের মত খাদ্যদ্রব্যাদি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

চিল্কাহ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২২ ক্রোশ এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। কোন কোন স্থানে উত্তরাংশের প্রস্থ প্রায় ১০ ক্রোশব্যাপী, কিন্তু দক্ষিণাংশ প্রস্থে কোথাও ২।০ ক্রোশের অধিক নহে। ইহা একটি অতি-বিস্তৃত স্বল্প-গভীর জলাশয়; ইহার গভীরতা কোন স্থানেই ৪ হাতের অধিক নহে। একটি বহু বিস্তৃত উচ্চ বালির বাঁধ ইহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এক

সময়ে যে এই হ্রদ সমুদ্রের অধিকারভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালে নৈসর্গিক ঘটনাসূত্রে বালুকারাশি এক স্থানে স্তূপীকৃত হইয়া প্রাচীরের আকারে সমুদ্রের অখণ্ড জলরাশিকে খণ্ডীকৃত করিয়া এই বিপুল হ্রদের সৃজন করিয়াছে। শুনিলাম বালুকাময় প্রাচীরের মধ্য দিয়া সমুদ্রের সহিত এই হ্রদের যোগ আছে। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে এই হ্রদের জল সমুদ্রজলের ন্যায় লবণাক্ত থাকিলেও, স্থানীয় লোকের মুখে অবগত হইলাম যে, বর্ষার পরে হ্রদের জলের লবণাক্ত দোষ কাটিয়া যায়, এমন কি, তখন ঐ জল পান করিবার উপযুক্ত হয়। আমি গ্রীষ্মকালে যখন হ্রদ দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন হ্রদের জল ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল এবং দেখিতেও পরিষ্কৃত ছিল না। হ্রদের তীরে যাইয়া একটা অপ্রীতিকর আঁশটে গন্ধ অনুভূত হইয়াছিল। সেই সময়ে বায়ুসংযোগে জলরাশিমধ্যে তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া হ্রদটি সমুদ্র বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমরা নৌকা সংগ্রহ করিয়া তীর হইতে বহুদূরে গমন করিয়াছিলাম। জলবিহারের ইচ্ছা থাকিলে পূর্ব্ব হইতে নৌকার ব্যবস্থা করিতে হয়। হ্রদের মধ্যে ৪।৫টি হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতা-শোভিত মনোরম ক্ষুদ্র দ্বীপ অবস্থিত আছে। এই সকল দ্বীপে মনুষ্যের বাস নাই। আমরা কোন দ্বীপে নামিতে সাহস করি নাই। দ্বীপগুলি শরবনে আবৃত; ব্যবসায়ীরা মধ্যে মধ্যে নৌকায় আসিয়া এই স্থান হইতে শর সংগ্রহ করে। এই দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে পারিকুঁদ্ নামক দ্বীপপুঞ্জ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা বিবিধ পাদপরাজিতে পরিপূর্ণ এবং নানা জাতীয় সুকণ্ঠ বিবিধবর্ণে চিত্রিত পক্ষিকুল তথায় বাস করে। অন্য দ্বীপ হইতে ইহা আকারে অনেক বড় এবং দৃশ্যে অতীব রমণীয়।

চিল্কায় বিস্তর মাছ আছে। ধীবরের নৌকা সাহায্যে জাল ফেলিয়া মাছ সংগ্রহ করে। মাছ এখানে খুব সস্তা দরে কিনিতে পাওয়া যায়। ছোট চিংড়ি অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হ্রদের মধ্যে জন্মে।

এই হ্রদ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক। কথিত আছে যে, ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব এই স্থানে প্রকৃতির স্নিগ্ধ, শান্ত, নয়ন-মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া হ্রদের জলে পতিত হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকার প্রণীত পুস্তকাবলী।

খাদ্য। (Food in Bengali) —৪র্থ সংস্করণ। মূল্য ২৲ টাকা।

"A copy of this book ought to be possessed by every Bengali householder". ENGLISHMAN.

"The utility and importance of such a treatise cannot be overestimated". BENGALEE.

"The Educational authorities will do well to buy copies of this book for free distribution amongst schools and colleges in Bengal". EMPIRE.

"You have earned the gratitude of your countrymen by writing this really useful book". SIR GOOROODASS BANERJEE, KT., M A., D.L, PH.D.

"আমরা এই পুস্তকখানি ঘরে ঘরে দেখিতে চাই"– প্রবাসী।

"In the present edition (4th edition), the author has dealt very exhaustively with almost all kinds of food generally eaten by our countrymen ....The book has been written in a clear, simple and chaste language, as much free from technical and scientific terms as the nature of the subject allows." AMRITA BAZAR PATRIKA.

শারীর স্বাস্থ্যবিধান (Personal Hygiene in Bengali).—২য় সংস্করণ। মূল্য ১৷৹ টাকা।

A useful and practical little book. "INDIAN MEDICAL GAZETTE.

"The book must be regarded as the best of its kind." INDIAN MIRROR.

"This work on Hygiene in Bengali should find its way in every Bengali household." INDIAN DAILY NEWS.

"It removes a really great want." BENGALEE.

"A most valuable addition to this particular section of our Bengali literature." AMRITA BAZAR PATRIKA.

রসায়ন-সূত্র (Elements of Physics and Chemistry in Bengali)—৬ষ্ঠ সংস্করণ—Thoroughly revised and enlarged. *The only book on Physics and Chemistry* in *Bengali for students of Madical Schools and Colleges in Bengal.* মূল্য ৩৲ টাকা।

"It is written in a clear style and is eminently suited to the comprehension of those for whom it is intended." CALCUTTA GAZETTE.

ফলিত রসায়ন (Practical Chemistry in Bengali)— মূল্য ১।০ আনা।

পল্লী-স্বাস্থ্য (Village Sanitation in Bengali) —২য় সংস্করণ। মূল্য ।০ আনা।

A text-book and a Library and Prize book selected by the Governments of Assam and Bengal respectively.

"It is a charming and instructive booklet written in the simple and beautiful style of which you are a master. It should be introducad into every vernacular school."
SIR J. C. BOSE KT., F. R. S., C. S. I., C. I. E., D. Sc.

HEALTH OF INDIAN STUDENTS.

2nd Edition. Price As. -/2/-

"I only hope what you have said in this lecture will not fall on deaf ears." Mr. W. W. Hornell, C. I. E.

"The student ought to read it with close attention and follow with scrupulous care the valuable advice it gives." Sir GOOROODASS BANERJEE, KT., M. A., D. L., PH.D.

"The instructions contained in this book are simply invaluable" BENGALEE

"I agree very strongly with you say." Lt. Col. Sir W. F. Buchanan, KT., C. I. E., M. D., I. M. S.

SIR GOOROODASS BANERJEE (Life of)

Published by Messrs. S. K. Lahiri & Co , 56, College Street, Calcutta.

Selected as a Prize and Library book by the Government of Bengal. Price Rs. 2/-

"The book is worth its weight in gold." B.C.O.S. Journal.

"It should be studied by our old and young alike for the many useful lessons it inculcates" HINDUSTHAN REVIEW.

THE SCIENTIFIC AND OTHER PAPERS. VOLUMES I & II.

Edited by J. P. BOSE M. B., F. C. S.

Price Rs. 5/- each Volume.

Opinions on Volume I.

"There is a wealth of carefully collected and observed facts in the book, an account of much original

research work and above all, medico-legal case-histories, notes and informations of the greatest value to civil surgeons and medico-legal workers in India."—INDIAN MADICAL GAZETTE.

"The chemical, pharmacological and toxicological reports reperesent much excellent laboratory work." BRITISH MEDICAL JOURNAL.

"These are all valuable contributions to medical literature and the book ought to find a place in the lib ary of every medical practitioner." INDIAN MEDICAL RECORD.

"Most of the papers will be read with intense interest by students of Medicine." AMRITA BAZAR PATRIKA.

'The papers and articles contain an extraordinary amount of unusual and accurate information." SCOTTISH CHURCHES COLLEGE MAGAZINE.

"His contributions to these subjects have won him a reputation of which his countrymen are justly pround" MODERN REVIEW.

"The majority of the papers in the medico-legal section are hightly interesting and will be very helpful to those who have frequently to deal with medico-legal cases."—INDIAN JOURNAL OF MEDICINE.

"Many of the papers are of permanent interest and the book will be widely welcomed." STATESMAN.

Opinion on Volume II.

"The main interest of the Book lies in the papers on Public Health and Temperance, which may be re-

garded as forming together a manual of conduct for citizens—including a section aiming specially at students, for whose enlightenment the author always was, and is an ardent worker".—STATESMAN.

"I have read some of the papers already and thoroughly enjoyed them"—BARON SINHA OF RAIPUR.

"It may be said at once that this is a most valuable book."—SCOTTISH CHURCHES COLLEGE MAGAZINE.

"A most interesting series of articles".—SIR J. C. BOSE, KT., F.R.S., C.S.I., D.SC.

"It is indeed a treasure for the young and old people".—SIR KAILAS CHANDRA BOSE, KT., C.I.E., O.B.E.

"The book is full of interest, not only to the educated medical man of Indian nationality, but also to the European reader. It presents the mature views and opinions of a brilliant and widely educated Indian savant and thinker, thoroughly familiar with the many and important questions with which he deals, free fram prejudice, but filled with ambition for the bettarment of the condition of the people. Its informative value is very great".—INDIAN MEDICAL GAZETTE.

নীলাচল—পুরী যাইবার পথে প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তি যাহা কিছু আছে এবং পুরীধামে তীর্থ-হিসাবে ভক্ত-যাত্রীগণের যাহা কিছু দর্শনীয় ও করণীয়, তাহা চিত্রসাহায্যে প্রাঞ্জল ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্ত বা ভ্রমণকারী পুরী-যাত্রী ইহা পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন। মূল্য ১৲ টাকা।